Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব, ফজিলত ও নামাজ তরককারীর বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি যোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

দেলোয়ার হোসেন

রোলঃ ২১৬০১১২১৭

০১ লা জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব, ফজিলত ও নামাজ তরককারীর বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি যোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

দেলোয়ার হোসেন

রোলঃ ২১৬০১১২১৭

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "**নামাজের গুরুত্ব, ফজিলত ও নামাজ তরককারীর বিধান**" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে **'দেলোয়ার হোসেন, আইডিঃ ২১৬০১১২১৭'** বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি যোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "**নামাজের গুরুত্ব, ফজিলত ও নামাজ তরককারীর বিধান**" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের **মুফতি যোবায়ের হাসান** উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র টি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

দেলোয়ার হোসেন

আইডিঃ ২১৬০১১২১৭

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

০১ লা জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

بِسْـــــــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْـــمِ

নামাজ শব্দটি মূলত ফারসি শব্দ। বাংলা ও উর্দু ভাষাতেও এ শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক। আরবি ভাষায় যাকে সালাত বলা হয়। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে সালাত হলো অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। আর সালাত বলা হয় নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত ইবাদত করাকে। জীবনের কোনো অবস্থাতেই সালাত পরিত্যাগ করা যাবে না। মহান আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে ঈমানের সাথে সাথে সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন- 'হেদায়াত খোদাভীরুদের জন্য, যারা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত কায়েম করে আর আমার প্রদানকৃত জীবনোপকরণ থেকে খরচ করে।' (সূরা বাকারা: ৩)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন- 'আপনার পরিবার-পরিজনকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো জীবনোপকরণ চাই না, রুজি তো আমিই দেবো। আর উত্তম পরিণতি পরহেজগারির মধ্যে রয়েছে।' (সূরা ত্ব-হা: ১৩২)।

নবী করিম (সা:) ইরশাদ ফরমান, 'কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি তা উত্তম ও পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তাহলে অন্যান্য আমলও সঠিক বলে গণ্য হবে। আর যদি তা খারাপ হয়, তবে অন্যান্য আমলও খারাপ বলে গণ্য হবে।' (তাবারানী)।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে নিজেকে তার প্রভুর কাছে সমর্পণ করা। আর সালাত হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর কাছে শারীরিক ও মানসিকভাবে সপে দেওয়ার সবচেয়ে সুন্দর মাধ্যম।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার জন্য। তাই সালাতের মাধ্যমে যেমন আল্লাহকে খুশি করা যায়, ঠিক তেমনি নিজেও মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের দ্বিতীয়টি হচ্ছে সালাত, পবিত্র কুরআন ও হাদিস গ্রন্থে বহু জায়গায় সালাত কায়েম করার তাগিদ ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয।' (সূরা আন-নিসা: ১০৩)

আল্লাহ সালাতকে ফরয করে দিয়েছেন বিধায় কোনো অবস্থাতেই বিনা ওযরে (ইচ্ছা করে) সালাত ছাড়া যাবে না। (ইসলামিক পরিভাষায় 'ফরয' মানে হচ্ছে অবশ্যই করণীয়)।

আল্লাহ তায়া’লা আরো বলেন, “তোমরা আল্লাহ অভিমুখী হও এবং তাকে ভয় কর আর সালাত প্রতিষ্ঠা কর, এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।” (সূরা আর-রুম: ৩১)

সালাতের মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে, তাই সালাত আল্লাহর আনুগত্য লাভের জন্য একটি সুন্দর ইবাদাত। একাগ্র মনে সালাত আদায়কারী নিজের ও সমাজের কল্যান ব্যতীত কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। এছাড়া সালাত মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

সালাত শব্দের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা

’সালাত’ শব্দটি কোন ধাতু (মূল শব্দ) হতে উদগত এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তা সালাত তথা রহমত শব্দ থেকে উদগত। কারো মতে তা সালাত তথা দু’আ থেকে উদগত। আবার কারো মতে তা الصلوين থেকে উদগত যার অর্থ ঐ দু’টি রগ সালাত আদায়ের সময় যা বক্র হয়। আবার কারো মতে الصلى (অগ্নিতে প্রবেশ) শব্দ হতে উদগত। ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ গ্রন্থে এ সম্পর্কে সুহায়লী (রহঃ) থেকে সুন্দর কথা বর্ণনা করেছেন।
সালাতের শাব্দিক অর্থ দো‘আ। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ

“আর তাদের জন্য দো‘আ করুন, নিশ্চয় আপনার দো‘আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর।”
(সূরা তাওবা: ১০৩)।

শর‘ঈ পরিভাষায় সালাত হলো, সুনির্দিষ্ট শর্তাবলীতে নির্দিষ্ট কিছু কথা ও কাজ, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম ফিরানোর দ্বারা শেষ হয়।

সালাত আরবি শব্দ। এর ফার্সি প্রতিশব্দ হলো নামাজ। এর অর্থ দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা ও রহমত (দয়া) কামনা করা। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করে, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে তাই একে সালাত বলা হয়। সালাত তাকবিরে তাহরিমা দ্বারা শুরু হয় ও সালাম ফিরানো দ্বারা শেষ হয়’। ইসলাম যে পাঁচটি রুকনের উপর প্রতিষ্ঠিত তার দ্বিতীয়টি হলো সালাত।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, “নির্দিষ্ট রুকন ও জিকিরসমূহকে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে আদায় করাকে সালাত বলে।”

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “দ্বীনের মস্তক ইসলাম এবং তার স্তম্ভ হলো সালাত।”

মুজামূল ওয়াসীত গ্রন্থগার বলেন, “শরীয়াতে নির্ধারিত সময়ে ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম সালাত।”

তানজীমুল আশতাত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, “নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কিছু আরকান ও কাজের সমষ্টি সালাত।” সহজভাবে বলা যায়, নির্দিষ্ট কিছু আরকানসহ নির্ধারিত সময়ে আদাকৃত একটি ইবাদতের নাম নামাজ বা সালাত। যা সকল মুসলমানের উপর ফরজ।

পবিত্র কুরআনে নামাজের বিভিন্ন অর্থ

সালাত বা নামাজ এমন ইবাদত, যা সকল আসমানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। যদিও তা আদায়ের পদ্ধতি পরস্পর থেকে ভিন্ন। ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, ‘আল্লাহ কোনো যুগকে শরিয়তমুক্ত রাখেননি এবং কোনো শরিয়তকে নামাজমুক্ত রাখেননি।’ পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে নামাজের বর্ণনা এসেছে। কুরআনে নামাজকে ‘সালাত’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে সালাত শব্দটি শুধু নামাজ অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি। সালাতের সাধারণ অর্থ : আরবি সালাত শব্দের সাধারণ অর্থ দুটি।

ক। আগুন বা সদৃশ উত্তপ্ত জিনিস।

যেমন—বলা হয়, ‘সল্লাইতুল উদা বিন-নারি’ (আমি আগুন দ্বারা উদ প্রজ্বলিত করেছি)।

খ। দোয়া বা প্রার্থনা। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, নামাজকে সালাত বলা হয় কেননা তাতে দোয়া ও প্রার্থনা আছে।

কুরআনে ‘সালাত’ শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : পবিত্র কোরআনে ‘সালাত’ শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

১. ফরজ নামাজ : পবিত্র কুরআনে ‘সালাত’ শব্দটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফরজ নামাজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষত যখন তা জাকাতের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা নামাজ কায়েম করো।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ৪৩)

২. অনুগ্রহ : আল্লাহ বলেন, ‘তাদের প্রতি আছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহ।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৫৭)

৩. অনুগ্রহ প্রার্থনা : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য।’ (সূরা : আহজাব, আয়াত : ৪৩)

৪. ক্ষমা প্রার্থনা : আল্লাহ বলেন, ‘আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা তাদের জন্য প্রশান্তি লাভের উপায়।’ (সূরা : তাওবা, আয়াত : ১০৩)

৫. কুরআন তিলাওয়াত : আল্লাহ বলেন, 'তুমি তোমার সালাতে স্বর উঁচু করো না এবং তাতে মৃদুও করো না; বরং এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর।' (সূরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১১০)

৬. ভয়ের নামাজ : যুদ্ধের ময়দানে ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে এবং সৈনিকদের জীবনে ঝুঁকি তৈরি হলে বিশেষ পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করতে হয়। শরিয়তের পরিভাষায় তাকে 'সালাতুল খউফ' বা ভয়ের নামাজ বলা হয়। কুরআনে 'সালাত' শব্দ দ্বারা বিশেষ এই নামাজকেও বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে এবং তাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করবে, তখন তাদের একদল তোমার সঙ্গে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে।' (সূরা : নিসা, আয়াত : ১১০)

৭. জানাজার নামাজ : সালাত দ্বারা জানাজার নামাজও উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেন, 'তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাজার নামাজ পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না; তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।' (সূরা : তাওবা, আয়াত : ৮৪)

৮. জুমার নামাজ : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! জুমার দিন যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও।' (সূরা : জুমা, আয়াত : ৯)

৯. নামাজের জামাত : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা যখন নামাজের (জামাতে সমবেত হওয়ার) জন্য আহ্বান করো, তখন তারা তাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে।' (সূরা : মায়িদা, আয়াত : ৫৮)

১০. ইবাদতের স্থান : সালাত শব্দটি কুরআনে ইবাদতের স্থান অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, সালাওয়াত তথা ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদগুলো, যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম।' (সূরা : হজ, আয়াত : ৪০)

১১. দরুদ : কুরআনে সালাত শব্দটি নবীজি (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠের অর্থেও এসেছে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।' (সূরা : আহজাব, আয়াত : ৫৬)

১২. দ্বীনদারি : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারা বলল, হে শোয়াইব! তোমার নামাজ কি তোমাকে এই নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদত করত আমাদের তা বর্জন করতে হবে অথবা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও? তুমি অবশ্যই সহিষ্ণু, ভালো মানুষ।' (সূরা : হুদ, আয়াত : ৮৭)। কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, এই আয়াতে নামাজ দ্বারা ঈমান ও দ্বীনদারি উদ্দেশ্য।

নামাজের সূচনা ও ইতিহাস

নামাজ ইসলামের অন্যতম ইবাদত। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হয়। এই নামাজের বিধান দেওয়া হয়েছে পবিত্র শবে-মেরাজে। প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী সেটি ছিল হিজরতের এক বছর আগে। কেউ কেউ বলেন, এটি ছিল হিজরতের এক মাস আগে। তাহলে এর আগে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কার জীবনে কি নামাজের বিধান ছিল না—এ প্রশ্নের জবাবে ইতিহাসবিদদের মতপার্থক্য দেখা যায়। মোকাতেল ইবনে সোলায়মান (রহ.) বলেন, ইসলামের শুরুর দিকে মহান আল্লাহ দুই রাকাত নামাজ সকালে ও দুই রাকাত নামাজ সন্ধ্যার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। সকাল-সন্ধ্যার ইবাদত সূচনা থেকেই ছিল।

ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম মেরাজের ঘটনার আগেই নামাজ আদায় করতেন। তবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে অন্য কোনো নামাজ ফরজ ছিল কি না। কেউ কেউ বলেন, সূর্য উদয় হওয়ার আগে ও অস্ত যাওয়ার আগে এক একটি নামাজ ফরজ ছিল।

বারা ইবনে আজেব (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ ধরনের হাদিস বর্ণিত রয়েছে।ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, এই নামাজ ছিল প্রথম দিকে ফরজের অন্তর্ভুক্ত। (মুখতাসারুস সিরাহ, শেখ আবদুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৮৮)

ইবনে হিশাম (রহ.) বর্ণনা করেছেন, (ইসলামের সূচনাকালে) রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম নামাজের সময় পাহাড়ে চলে যেতেন এবং গোপনে নামাজ আদায় করতেন। একবার আবু তালেব রাসূল (সা.) ও আলী (রা.)-কে নামাজ পড়তে দেখে ফেলেন। তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁকে জানানোর পর তিনি বলেন, এই অভ্যাস অব্যাহত রেখো। (ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৭)।

নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকেই নামাজ ফরজ হয়। তবে তখন নামাজ ছিল কেবল ফজর ও আছরে দু' দু' রাকাত করে (কুরতুবী)। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, ‘আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপন করুন সূর্যাস্তের পূর্বে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে।’ (গাফির/মুমিন ৪০/৫৫; মিরআত ২/২৬৯)

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘শুরুতে নামাজ বাড়ীতে ও সফরে ছিল দু' দু' রাকাত করে।’ (মুসলিম হা/৬৮৫; আবুদাউদ হা/১১৯৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১১)

এছাড়া রাসূল (সা.)-এর জন্য অতিরিক্ত ছিল তাহাজ্জুদের নামাজ (ইসরা/বনু ইসরাঈল ১৭/৭৯)। সেই সাথে সাহাবীগণও নিয়মিতভাবে রাত্রির নফল নামাজ আদায় করতেন। (মুযযাম্মিল ৭৩/২০; তাফসীরে কুরতুবী)।

তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, হিজরতের পূর্বে ইসরা তথা মি‘রাজের রাতে ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়। ইসলামে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাক্ষ্য প্রদানের পরের রুকন হলো সালাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের পরে সালাতের শর্ত দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ فِي سبيل الله۞

“সব কিছুর মাথা হলো ইসলাম, বুনিয়াদ হলো সালাত আর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ”। (তিরমিযী: ২৬১৬)

নামাজ বলতে আমরা আল্লাহর উদ্দেশে নিজেদের সমর্পণকে বুঝি। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দিনে ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। এই পাঁচ ওয়াক্ত হলো ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা।

এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কেমন করে আমাদের জন্য এল, সে কথা বুখারী শরিফে বর্ণনা করা হয়েছে। “হযরত আবু যর (রা.)–এর বরাতে একটি হাদিসে বলা হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘তিনি বলেছেন, আমি মক্কায় থাকা অবস্থায় আমার ঘরের ছাদ খুলে দেওয়া হলো। তারপর জিবরাইল (আ.) এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তা জমজমের পানি দিয়ে ধুলেন। এরপর হিকমত ও ইমানে ভর্তি একটি সোনার পাত্র নিয়ে এসে আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আকাশের দিকে নিয়ে চললেন।

আনাস (রা.) বলেন, ‘আবু যর (রা.) উল্লেখ করেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) আসমানগুলোতে আদম (আ.), ইদ্রিস (আ.), মুসা (আ.), ঈসা (আ.) ও ইব্রাহিম (আ.)-এর সাক্ষাৎ পান। তবে আবু যর (রা.) সেসব স্থান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। শুধু এটুকু উল্লেখ করেছেন যে তিনি আদম (আ.)-কে দুনিয়ার আকাশে ও ইব্রাহিম (আ.)-কে ষষ্ঠ আকাশে পেয়েছিলেন।’

‘পরে যখন দুনিয়ার আকাশে আসলাম জিবরাইল (আ.) আসমানের রক্ষককে বললেন, দরজা খোলো। আসমানের রক্ষক বললেন, আপনি কে? জিবরাইল (আ.) বললেন, আমি জিবরাইল (আ.)। (আকাশের রক্ষক) বললেন, আপনার সঙ্গে কি কেউ রয়েছেন? জিবরাইল (আ.) বললেন, হ্যাঁ, মুহাম্মাদ (সা.) রয়েছেন। রক্ষক তখন বললেন, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? জিবরাইল (আ.) বললেন, হ্যাঁ।

‘এরপর যখন আমাদের জন্য দুনিয়ার আসমান খুলে দেওয়া হলো, আর আমরা দুনিয়ার আসমানে প্রবেশ করলাম, তখন দেখি সেখানে একজন বসে আছেন যাঁর ডানে এবং বাঁয়ে অনেকগুলো মানুষের আকৃতি রয়েছে। তিনি ডানদিকে তাকালে হেসে উঠছেন, আর বাঁয়ে তাকালে কাঁদছেন। তিনি বললেন, স্বাগত, হে সৎ নবী ও সৎ সন্তান। আমি জিবরাইল (আ.) কে প্রশ্ন করলাম, এই ব্যক্তিটি কে?

তিনি জবাব দিলেন, ইনি আদম (আ.)। তাঁর ডানে-বাঁয়ে রয়েছে তাঁর সন্তানদের রুহ। ডান দিকের লোকেরা জান্নাতি, বাঁম দিকের লোকেরা জাহান্নামী। তাই ডানে তাকালে তিনি হাসছেন, বাঁয়ে তাকালে কাঁদছেন।

‘এরপর জিবরাইল (আ.) আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন। তারপর এর রক্ষককে বললেন, দরজা খোলো। তখন এই রক্ষক প্রথম রক্ষকের মতোই প্রশ্ন করলেন। পরে দরজা খুলে দেওয়া হলো।’ আনাস (রা.) বলেন, ‘জিবরাইল (আ.) যখন মহানবী (সা.)-কে নিয়ে ইদ্রিস (আ.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ইদ্রিস (আ.) বলেন, বাহ্, ও ভাই, ও পুণ্যবান নবী। আমি (রাসূলুল্লাহ) বললাম, তিনি কে? জিবরাইল (আ.) বললেন ইনি হচ্ছেন ইদ্রিস (আ.)।

এরপর আমি মুসা (আ.)-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন, বাহ্, হে সৎ নবী ও পুণ্যবান ভাই। আমি বললাম, ইনি কে? জিবরাইল (আ.) বললেন, ইনি মুসা (আ.)।

অতঃপর আমি ঈসা (আ.)-কে অতিক্রম করার সময় তিনি বললেন, বাহ্, হে সৎ নবী ও পুণ্যবান ভাই। আমি প্রশ্ন করলাম, তিনি কে? জিবরাইল (আ.) বললেন, তিনি ঈসা (আ.)। তারপর আমি ইব্রাহিম (আ.)-কে পেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বললেন, বাহ্, হে পুণ্যবান নবী ও পুণ্যবান সন্তান। আমি বললাম, ইনি কে? জিবরাইল (আ.) বললেন, ইনি ইব্রাহিম (আ.)।’

ইবনে শিহাব বলেন, ইবনে হাযম (রহ.) আমাকে বলেছেন যে ইবনে আব্বাস ও আবু হাব্বা আল-আনসারী উভয়েই বলতেন, ‘নবী (সা.) বলেছেন, এরপর আমাকে আরও ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো। এমন একটি সমতল স্থানে নেওয়া হলো যেখানে আমি লেখার শব্দ শুনতে পেলাম।’

ইবনে হাযম ও আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেছেন যে ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তারপর আল্লাহ আমার উম্মতের ওপর ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিলেন। আমি সেটা নিয়ে ফিরে আসি। মুসা (আ.)-কে পার হওয়ার সময় তিনি বললেন, আল্লাহ আপনার উম্মতের ওপর কী ফরজ করেছেন? আমি বললাম, ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। তিনি বললেন, আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে ফিরে যান, আপনার উম্মত তো এতটা পালন করতে পারবে না। আমি তখন ফিরে গেলাম। আল্লাহ তাআলা কিছুটা কমিয়ে দিলেন। আমি মুসা (আ.)-কে পার হওয়ার সময় বললাম, কিছুটা অংশ (আল্লাহ) কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আপনি আবার আপনার রবের কাছে ফিরে যান। কারণ আপনার উম্মত এটুকুও আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরও কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া হলো। আবারও মুসা (আ.)-এর কাছে গেলাম। এবারও তিনি বললেন, আপনি আবার আপনার প্রতিপালকের কাছে যান। কারণ আপনার উম্মত এও আদায় করতে পারবে না। তখন আমি আবার গেলাম। তখন আল্লাহ বললেন, এই পাঁচটিই (পূণ্যের হিসাবে) ৫০ (বলে গণ্য হবে)। আমার কথার কোনো রদবদল হয় না।

আমি আবার মুসা (আ.)-এর কাছে গেলে তিনি আমাকে আবারও বললেন, আপনার প্রতিপালকের কাছে আরেকবার যান। আমি বললাম, আরেকবার আমার প্রতিপালকের কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। তখন জিবরাইল (আ.) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। সে সময় সেটি নানা রঙে রঞ্জিত ছিল। আমি এর তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত ছিলাম না।" (বুখারী: ৩৪৯)

মিরাজের রাত্রিতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৫ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'মিরাজ' অনুচ্ছেদ-৬)।

উক্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হল- ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা। (আবু দাউদ হা/৩৯১, ৩৯৩ সালাত অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১)।

এছাড়া রয়েছে জুম'আর ফরয সালাত, যা সপ্তাহে একদিন শুক্রবার যোহরের সময় পড়তে হয়। (জুমা ৬২/৯; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৫৪, 'জুম'আ অনুচ্ছেদ-৪২, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৭)

নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামাজ। ইমানের পর নামাজের চেয়ে গুরুত্ব অন্য কোনো ইবাদতে প্রদান করা হয়নি। কোরআন শরিফে ৮৩ বার নামাজের আলোচনা এসেছে। নামাজ ফরজ হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, 'হে নবী! আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুমিন তাদের বলুন, নামাজ কায়েম করতে।' (সূরা ইবরাহিম, আয়াত-৩১)।

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'তোমরা লোকদের সঙ্গে উত্তমভাবে কথা বলবে এবং নামাজ আদায় করবে।' (সূরা বাকারাহ, আয়াত-৮৩)।

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তুমি বলে দাও, আমার রব ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় তোমাদের মুখমণ্ডল স্থির রেখ।' (সূরা আরাফ, আয়াত-২৯)।

অন্যত্র বলেন, 'অতএব, আল্লাহকে সিজদা কর এবং তার ইবাদত কর।' (সূরা নাজম, আয়াত-৬২)।

সূরা বাকারার শুরুতে আল্লাহ তায়া'লা মুত্তাকীদের পরিচয় দিতে ইরশাদ করেন, 'যারা অদৃশ্যের বিষয়গুলোতে ইমান আনে এবং নামাজ কায়েম।' (সূরা বাকারাহ, আয়াত-৩)।

আল্লাহ তায়া'লা নামাজের উপকার সম্পর্কে ইরশাদ করেন, এবং নামাজের পাবন্দি কর দিনের দুপ্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিঃসন্দেহে সৎ কাজসমূহ অসৎ কাজসমূহকে মিটিয়ে দেয়।'
(সূরা হূদ, আয়াত-১১৪)।

নামাজের ব্যাপক কল্যাণসমূহের উল্লেখযোগ্য একটি হলো নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, 'নামাজের পাবন্দি কর। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আনকাবুত, আয়াত-৪৫)।

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে আমি এরূপ সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করি না।' (সূরা আরাফ, আয়াত-১৭০)।

অন্যত্র ইরশাদ করেন, 'মুমিনরা নামাজ আদায় করে, জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন।'
(সূরা তওবা, আয়াত-৭১)।

সূরা বাইয়্যিনাতে আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের দ্বিতীয় ধাপ স্বরূপ নামাজকে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তাদের এছাড়া কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহতায়ালার ইবাদত করবে এবং নামাজ কায়েম করবে।' (সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত-৫)।

যে ব্যক্তি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামাজকে সব শর্তসহ খুশু-খুযুর সঙ্গে নবী তরিকায় আদায় করবে তার এই নামাজ তাকে সব ধরনের অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর খুশু-খুযুর সঙ্গে নামাজ আদায়কারীদের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় সব মুমিন নামাজ আদায় করে।' (সূরা মুমিনূন, আয়াত: ১-২)।

তাছাড়া নামাজের ব্যাপারে যারা উদাসীন থাকে তাদের ব্যাপারে শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, 'দুর্ভোগ সেসব নামাজির জন্য নিজেদের নামাজের ব্যাপারে যারা থাকে গাফেল।' (সূরা মাউন, আয়াত: ৪-৫)।

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, '(সেদিন) অপরাধীদের সম্পর্কে পরস্পরে জিজ্ঞাসা করবে যে, কিসে তোমাদের জাহান্নামের ঠেলে দিয়েছে? তারা বলবে, আমরা নামাজি ছিলাম না।'
(সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪২-৪৩)।

আর রোজ হাশরে নামাজের মাধ্যমেই হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। যার নামাজ সঠিক হবে তার অন্যান্য আমলও সঠিক বলে বিবেচিত হবে। আর যার নামাজ অসুন্দর হবে তার অন্যান্য আমলও অসুন্দর বলে গণ্য হবে। নামাজ তরককারী ব্যক্তি ইসলামি জীবন থেকে বঞ্চিত এবং তার জীবনযাপন কাফেরের জীবনযাপনের মতোই।

এ মর্মে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'বান্দা ও কুফরের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো নামাজ ত্যাগ করা।' (মুসলিম, মেশকাত)।

হযরত উবাদা ইবনে সামির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) আমাদের সাতটি অসিয়ত করেন, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজ হলো- তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক কর না। যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করে ফেলা হয় বা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় আর ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ কর না। কেননা যে ইচ্ছা করে নামাজ ছেড়ে দেয় সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

নামাজের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য

ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান ও আমলের মাঝেই যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। ইসলামে এমন কোন আমল নেই যা মুসলমানের জন্য পালন করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। ইসলামে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে। কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত। এই পাঁচটি স্তম্বের মধ্যে ‘কালেমা’ যার মাধ্যমে মানুষ স্বীকারে করে নেয় যে তার প্রভূ একমাত্র আল্লাহ। কালেমার পরই নামাজ অন্যতম একটি স্তম্ব এবং ইসলামে নামাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ‘আমি জ্বিন জাতি ও মানব সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে।’ (সূরা যারিয়াত : ৫৬)।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্বের মধ্যে নামাজ এবং রোজা ধনী, দরিদ্র সকলের জন্যই ফরজ। তবে হজ্জ এবং যাকাতের বিধান শুধুমাত্র ধনী ব্যাক্তিদের জন্য ফরজ করা হয়েছে। শারীরিক অসুস্থতাসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফরজ রোজা ভঙ্গ করার হুকুম রয়েছে এবং পরে তা আদায় করে নেওয়া যায়। রোজা ভঙ্গের পর অক্ষম ব্যাক্তি ফকির, মিসকিনকে পেট ভরে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে রোজার কাফফারা আদায় করতে পারবেন এইরকম বিধানও ইসলামে রয়েছে।

তবে নামাজের ক্ষেত্রে কাযা করার হুকুম শুধুমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে এবং নামাজের কোন কাফফারা বা বদলা হয় না। বলা হয়েছে যদি পানির অভাবে নামাজ কাযা হবার সম্ভবনা থাকে তবে সে যেন তায়াম্মুম করে হলেও নামাজ আদায় করে নেয়।

যদি কোন ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে না পারে সে যেন বসে বসে নামাজ আদায় করে নেয়। যদি কারো বসে বসে নামাজ পড়তেও কষ্টকর হয়ে পড়ে তারপরেও সে যেন শুয়ে নামাজ আদায় করে। এমনকি চোখের ইশারায় নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে।

দেহে জ্ঞান থাকা পর্যন্ত কোনো অবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্য নামাজ না পড়ার বা বাদ দেওয়ার বিধান নেই। জ্ঞানসম্পন্ন অসুস্থ অবস্থায়ও নামাজ আদায় করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামে সুস্থ ব্যক্তির জন্য যেমন নামাজের নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের ব্যাপারেও কিছু

নিয়মনীতি ঠিক করে দিয়েছেন। ইসলামে নামাজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল যা পৃথিবীর সকল মুসলমানদের জন্য ফরজ। প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য ঈমানের গ্রহণের পর প্রথম এবং প্রধান ইবাদত নামাজ। নামাজের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী যথা সময়ে নামাজ আদায় করাও জরুরি।

কেননা পরকালে সকল মুসলমানদের কাছে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তির নামাজের হিসাব দিতে সহজ হবে, তাঁর পরবর্তী সকল হিসাব সহজ হয়ে যাবে।

নামাজ আদায়ের সময় তা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে হবে। নামাজ আদায়ে দায়সারা ভাব দেখানো মোটেই উচিত নয়। নামাজের সবগুলো বিধান মেনে সঠিকভাবে নামাজ আদায় করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধ্যান রেখে পরিপূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'সেসব মুমিনরা সফলকাম, যারা তাদের নামাজে বিনয়াবনত থাকে।' (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১-২)।

সঠিকভাবে নামাজ আদায় ও মনোযোগ ধরে রাখার ব্যাপারে এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত উপদেশ কামনা করলে তিনি তাকে বলেন, 'যখন তুমি নামাজে দন্ডায়মান হবে তখন এমনভাবে নামাজ আদায় করো, যেন এটিই তোমার জীবনের শেষ নামাজ।' - (ইবনে মাজাহ, মিশকাত, হাদিস : ৫২২৬)।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন, যেন আপনি তাকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে) তিনি অর্থ্যাৎ আল্লাহ আপনাকে দেখছেন'।

নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। প্রতিদিন সিজদা দিয়ে বান্দা এটিই প্রমাণ করে যে, সে একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য করে না। একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই মহান রবের কাছাকাছি আসা যায়। একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই বান্দা তার প্রভুর সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পায়।

ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর সাথে বান্দা নামাজের মাধ্যমে সাক্ষাৎ করতে পারে এবং নিজের জন্য সাহায্য কামনা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমীমগণ তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।'

নামাজের মধ্যে অন্যতম একটি সৌন্দর্য হচ্ছে নামাজের সময় সকলেই সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে।

এক কাতারে যেমন গরিব ব্যাক্তি দাঁড়ায়, যাঁর পরনে জীর্ণ শীর্ণ ছেঁড়া কাপড় ঠিক একই নামাজের কাতারে একজন ধনী ব্যাক্তি দাঁড়ায়, যাঁর পড়নে দামী কাপড় ও সুগন্ধি।

শুধু ধনী গরিব নয় ছোট-বড়, বন্ধু-শত্রু, উর্ধ্বতন কর্মকতা - নিম্নতম কর্মচারী, ফকির-বাদশা মোটকথা সকল মুসলিম সব বিভেদ ভুলে গিয়ে মহান রবের ডাকে সাড়া দিতে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। সকলেই আল্লাহর কর্তৃত্বের কাছে প্রকাশ্যে মাথা নত করে। এটিই নামাজের আসল সৌন্দর্য্যের প্রতিফলন। নামায সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল। আর তাই এজন্যই বলা যায়, নামাজ হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার।

সহীহ শুদ্ধভাবে নামাজ পড়ার গুরুত্ব

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ঈমান গ্রহণের পর ইসলামে নামাজের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। মুসলমান হিসেবে নামাজই আমাদের প্রতিদিনের ফরজ দায়িত্ব। বান্দা ও প্রভুর মধ্যে নির্জন সেতুবন্ধের শ্রেষ্ঠতম উপায়। পরকালে আমাদের প্রতিটি আমলের হিসাব দিতে হবে মহান আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। সবার আগে দিতে হবে নামাজের হিসাব।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামাজ। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামাজ) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরজ (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে আল্লাহ বলবেন, 'দেখ তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দেওয়া হবে?' অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে। [আবু দাউদ ৮৬৪, তিরমিযি ৪১৩, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ইবনে মাজাহ ১৪২৫, ১৪২৬, আহমদ ৭৮৪২, ৯২১০, ১৬৫০১, দারেমি ১৩৫৫]

সেই নামাজ আদায়কারীর সংখ্যা এ বিশ্বে আজ কত? আর আমরা যারা নামাজ আদায় করি তাদের কত জনের নামাজ হচ্ছে সহিহভাবে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত তরিকা মতে? এর জন্য শুধু আমাদের অজানাই দায়ী নয়। রয়েছে যথেষ্ট অবহেলা। আল কোরআনের ভাষায় নামাজে অবহেলা মুনাফিকের অন্যতম নিদর্শন। (সূরা নিসা, আয়াত ১৪২)

নিয়মিত নামাজ না পড়া এবং নামাজে যথাযথভাবে মনোযোগ না দেওয়া, নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ না করা ইত্যাদি আমাদের অবহেলারই প্রতিফল।

আমরা কি মুনাফিক? না, আমরা সত্যিকার মুসলমান। তাহলে সঠিকভাবে নামাজ আদায়ে আমাদের কেন অবহেলা হবে? এ বিষয়ে জানা ও মানার ক্ষেত্রে আমাদের কেন উদাসীনতা থাকবে?

মহানবী (সা.) অসংখ্য সহি হাদিসে সঠিকভাবে নামাজ আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যথাযথভাবে নামাজ আদায় না করে শুধু দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। বরং সামান্য ত্রুটি বা অবহেলার কারণে নামাজ হয় অশুদ্ধ ও মূল্যহীন। এমন স্পষ্ট বর্ণনা বিভিন্ন হাদিসে এসেছে।

জনৈক সাহাবি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে নামাজ আদায় করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে তাকে সালাম করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ‘তুমি পুনরায় গিয়ে নামাজ আদায় কর, তুমি নামাজ আদায় করনি।’ ওই সাহাবি আবার নামাজ আদায় করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বলেন, ‘তুমি পুনরায় গিয়ে নামাজ আদায় কর, তুমি নামাজ আদায় করনি।’

এভাবে ওই লোকটিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনবার একই ধরনের নির্দেশ দেন। এরপর লোকটি বলেন, আপনাকে যিনি সত্যের বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে উত্তমরূপে নামাজ আদায় করতে পারি না, আমাকে তা শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন তাকে বললেন, ‘তুমি যখন নামাজে দাঁড়াও তাকবির বল, সাধ্যমতো কিরাত পড়। এরপর শান্তভাবে রুকু কর। তারপর শান্তভাবে উঠে দাঁড়াও। এরপর শান্তভাবে সিজদা কর। তারপর শান্তভাবে উঠে বস। এরপর শান্তভাবে সিজদা কর। এভাবে পূর্ণ নামাজ আদায় কর।’ (বুখারী)

নামাজ শুদ্ধভাবে আদায় হওয়ার দুটি পদ্ধতি। নামাজের যাবতীয় ফরজ, ওয়াজিব ও নিয়ম যথাযথভাবে সময়মতো আদায় হলে নামাজের বাহ্যিক রূপ সঠিকভাবে হয়েছে বলে গণ্য করা যায়। আর আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহর কাছে নামাজ শুদ্ধভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নামাজ মনোযোগসহকারে এবং বিনয়-নম্র অবস্থায় আদায় করতে হবে।

মহান প্রভু ঘোষণা করেন, ‘অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র।’ (সূরা মু’মিন, আয়াতঃ ১-২)

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন, ‘সমস্ত নামাজের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের ব্যাপারে। আর আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াও।’ (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ২৩৮)।

বিচারপতি আল্লামা তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ কতই না সুন্দর লিখেছেন, নবী (সা.)-এর সুন্নাত মোতাবেক নামাজ আদায় করা ও এর ব্যতিক্রমভাবে আদায় করাতে সময়ের তেমন ব্যবধান হয় না, পরিশ্রম বেশি হয় না। হয় না টাকা-পয়সা বা অন্য কোনো সামগ্রীর প্রয়োজন। তবে প্রয়োজন শুধু জানা। আর অবহেলা ও উদাসীনতাকে চিরতরে বিলীন করে দেওয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রভুকে সন্তুষ্ট করার প্রেরণায় সুদৃঢ়চিত্তে ইবাদতে মগ্ন হওয়া।

কুরআনে নামাযের গুরুত্ব : কিছু দিক কিছু কথা

কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম। দ্বীন ও শরীয়তের মূল উৎস। আসমানী শিক্ষা ও হেদায়েতের প্রধান স্তম্ভ। আমাদের সবার কর্তব্য, প্রতিদিন অল্প অল্প করে হলেও কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর শিক্ষা ও হেদায়েত দ্বারা জীবনকে আলোকিত করা।

আমরা যদি এ আলোকগ্রন্থ তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করি, তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাব, ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামায। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বিভিন্নভাবে নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং বিচিত্ররূপে নামাযের প্রতি আহ্বান করেছেন। এখানে আমরা কিছু দিক সম্পর্কে আলোচনা করব।

নামাযের আদেশ

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

“এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর।”
- সূরা বাকারা (২) : ৪৩। অন্যত্র বলেছেন-

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

“এবং তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন(-কে আঁকড়ে ধর)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম,পূর্বেও এবং এ কিতাবেও,যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।” - সূরা হজ্ব: ৭৮

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে (উম্মতে মুহাম্মাদী) সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন অন্য উম্মতেরা অস্বীকার করে বলবে যে, নবীগণ আমাদের নিকট দ্বীনের কথা পৌঁছাননি তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে-নিশ্চয় নবীগণ দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এটা আল্লাহর বড় নিআমত। এ নিআমতের শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং তাঁকে মজবুতভাবে ধরার আদেশ করেছেন।

এ থেকে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি এও বোঝা যায়, এই নিআমতের শুধু মৌখিক শোকরিয়া আদায় করা যথেষ্ট নয়; বরং আমলগতভাবেও শোকরিয়া আদায় করতে হবে। যে সকল আমল দ্বারা এ নিআমতের শোকরিয়া আদায় করা যায় তার শীর্ষে রয়েছে নামায, যাকাতসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। অপর আয়াতে নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন-

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ۝

“আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না।” - সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩১

এখানে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামাযের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে। অন্যত্র আল্লাহ সরাসরি নবীজীকে নামাযের আদেশ করেছেন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا۝

“তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের নামায (কায়েম কর)। নিশ্চয় ফজরের নামাযে সমাবেশ ঘটে।” - সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭৮

সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা কোন্ কোন্ নামায বুঝানো হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও সীরাতে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তা হল, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায। আর ফজরের নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর বিশেষত্বের একটি দিক হল এ সময়ে ফিরিশতাদের সমাবেশ ঘটে থাকে। নবীজীকে নামাযের আদেশ করে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ۝

“এবং তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এ একটি স্মারক।” – সূরা হূদ (১১) : ১১৪

দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম দ্বারা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায বুঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাহয় এর পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি এখানে নামাযের আদেশ করা হয়েছে, সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, পুণ্য পাপকে দূর করে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় নামায খুব মর্যাদাপূর্ণ আমল এবং এর দ্বারা গোনাহ মাফ হবে। নবীজীকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন-

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ۝

“ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।” - সূরা আনকাবুত (২৯) : ৪৫

এখানেও নামাযের আদেশ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর কিছু উপকারিতাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। হাঁ, নামাযের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। তবে প্রাণবন্ত নামায হতে হবে। যেরূপ নামাযের কথা কুরআন ও হাদীস বলে।

কুরআন হুকুম-আহকাম আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত পুংলিঙ্গের সম্বোধন করে। দ্বিমত নেই যে, পুরুষের মত মহিলারাও এসব আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত। কুরআনে এক স্থানে নবীপত্নীদের বিশেষভাবে সম্বোধন করে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাতে নামাযের আদেশও রয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا۝

“হে নবী পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ কোনো নারীর মত নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা কোমলভাবে কথা বলো না, অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসায় পড়বে আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বল। এবং তোমাদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহিলিয়াতের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না এবং নামায কায়েম কর। যাকাত আদায় কর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবে পবিত্র করতে।” - সূরা আহযাব (৩৩) : ৩২-৩৩

[নামাযের আদেশ সম্পর্কিত আরো আয়াতের জন্য দেখুন, সূরা বাকারাঃ ১১০, সূরা আনআমঃ ৭২, সূরা নূরঃ ৫৬, সূরা রূমঃ ৩১, সূরা মুজাদালাহঃ ১৩]

আল্লাহর আদেশমাত্রই গুরুত্বপূর্ণ। আদেশকারীর মর্যাদা এবং আদেশের ধরন ও অবস্থা অনুপাতে গুরুত্ব আরো বেশি হয়। আদেশকারী যত বড় হয় আদেশ তত বেশি গুরুত্ব বহন করে। এমনিভাবে যখন বারবার ও বিভিন্নভাবে আদেশ করা হয় তখনো আদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নামাযের আদেশ যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ করেছেন যিনি সবচেয়ে বড় এবং বিভিন্নরূপে করেছেন, সরাসরি বান্দাদের করেছেন, নবীর মাধ্যমে করেছেন, সরাসরি নবীকে করেছেন, নবীপত্নীদের করেছেন, তাই নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশি।

পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নামাযের নির্দেশ

কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর মত পূর্ববর্তী নবীগণকেও দিয়েছেন। কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, নামাযও ওসব বিষয়ের অন্যতম, যার বিধান আল্লাহ অন্যান্য নবীদেরকেও দান করেছেন (যদিও নামাযের সংখ্যা ও বিস্তারিত পদ্ধতি এক রকম ছিল না)। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.)-এর আলোচনা করে বলেন-

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ۝

“আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, যারা আমার নির্দেশে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত। আমি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে। আর তারা আমারই ইবাদতকারী ছিল।” - সূরা আম্বিয়া (২১) : ৭৩

মারইয়াম আলাইহাস সালাম যখন সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এলেন তখন তারা তাঁর প্রতি অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করতে লাগল।

তিনি ইশারায় তাদের জানালেন তারা যেন শিশুটিকেই জিজ্ঞাসা করে, কীভাবে তার জন্ম হয়েছে। তখন তারা বলল, আমরা দোলনার শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলব? এমন সময় আল্লাহ শিশুটির যবান খুলে দিলেন। দোলনার শিশু ঈসা মাসীহ বলতে শুরু করলেন-

اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰىنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ
وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا۝

“আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় আমি যেখানেই থাকি এবং আমাকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি। এবং আমাকে করেছেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগা। আর আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব।” - সূরা মারইয়াম (১৯) : ৩০-৩৩

এখান থেকে এটা যেমন জানা গেল যে, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল, তেমনি এও বোঝা গেল যে, নামায অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তো দোলনার শিশুর যবান দিয়ে আল্লাহ যে কটি কথা বলিয়েছেন তাতে নামায স্থান পেয়েছে। ঈসা মাসীহের এ বাণী থেকে আরো জানা গেল, যতদিন হায়াত থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামায পড়তে হবে।

মূসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ান থেকে সপরিবারে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে আগুন দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এলেন। আসলে এটা জাগতিক আগুন ছিল না। এটা ছিল আল্লাহর নূর। কাছে আসার পর আল্লাহ তাঁকে ডেকে বললেন-

اِنِّیْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى اِنَّنِیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ۞

“নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক। সুতরাং তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা তুমি পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায় রয়েছ। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যা বলা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোন। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর।” - সূরা ত্বহা (২০) : ১২-১৪

আয়াতের শৈলী থেকে বোঝা যায়, এখানেই মূসা আলাইহিস সালামকে নবুওত দান করা হয়। তো নবুওতের সূচনাতেই তাঁকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও নামায কায়েমের আদেশ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোত্তম ইবাদত।

আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। হাঁ, নামায আগাগোড়া আল্লাহর যিকির এবং এতে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। এটা নামাযের অনন্য বৈশিষ্ট্য। নামায ছাড়া অন্য কোনো বিধান এমন নেই, যা আদ্যোপান্ত আল্লাহর যিকির এবং

যেখানে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। শুধু তাই নয়; নামাযে রয়েছে বিভিন্ন অবস্থার যিকির- দাঁড়িয়ে যিকির, বসে যিকির, মাথা ঝুঁকিয়ে যিকির, মাটিতে লুটিয়ে যিকির। আল্লাহর বড়ত্বের যিকির, গৌরবের যিকির, পবিত্রতার যিকির, হামদ ও ছানার যিকির, প্রার্থনা ও নিবেদনের যিকির...। আমাদের উচিত যিকিরপূর্ণ এ ইবাদতটি মহব্বত ও মনোযোগের সাথে আদায় করা; অলসতা ও উদাসীনতার সাথে নয়। যিকিরের সঙ্গে কি উদাসীনতা মানায়? আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ۞

“আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর-বাড়ি কর এবং তোমাদের ঘরসমূহকে নামাযের স্থান বানাও এবং নামায কায়েম কর আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও।” - সূরা ইউনুস (১০) : ৮৭

এখান থেকে জানা গেল, মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-সহ তাঁদের গোটা সম্প্রদায়ের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল। আয়াতটি আরো নির্দেশ করে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নামায আদায় করতে হবে। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। প্রতিকূলতা দূর হবে।

কতিপয় তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এটা তখনকার কথা যখন বনী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল এবং ইবাদতখানায় নামায আদায়ে তাদের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তখন তাদেরকে নামায তরক না করে ঘরেই আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী নবীদের উপর যখন নামাযের বিধান ছিল তো তাঁদের উম্মতেরা অবশ্যই এর আওতাভুক্ত ছিল। বিশেষত সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে নামাযের বিধান দেওয়ার বিষয়টি কুরআন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ لَىِٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ۞

“নিশ্চয় আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে আমি বারজন নেতা নির্ধারিত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করব এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আর এর পরও তোমাদের মধ্যে যে কুফর অবলম্বন করবে, নিশ্চয় সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।”
- সূরা মায়েদা (৫) : ১২।
এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, বনী ইসরাঈলের উপর নামাযের বিধান ছিল। সেইসঙ্গে এটাও জানা গেল যে, নামাযসহ উপরিউক্ত আমলগুলো করলে আল্লাহর সঙ্গ লাভ হবে। গোনাহ মাফ করা হবে এবং জান্নাত দান করা হবে। [বনী ইসরাঈলকে নামাযের আদেশ করা সম্পর্কিত আরো আয়াতের জন্য দেখুন, সূরা বাকারা ৮৩; সূরা বাইয়্যিনা: ৫]

নামায মুমিনদের বৈশিষ্ট্য

একমাত্র মুমিনই আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল। আর কুরআনে বহু জায়গায় মুমিনদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ বস্তুত নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করছেন যে, যদি মুমিন হও তাহলে নামায কায়েম কর। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ۞

"তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনয়ী।" - সূরা মায়েদা (৫) : ৫৫

এখানে মুমিনদের বন্ধু কারা এ প্রসঙ্গে কেবল তিন শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

ক. **আল্লাহ**। খ. **রাসূল**। গ. **মুমিনগণ**।

তারপর এই মুমিনদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায কায়েম করে। আল্লাহ আরো বলেন-

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ۞

"ত্ব-সীন। এ কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত; মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ- যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" - সূরা নামল (২৭) : ১-৩। এ আয়াতেও মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে নামাযের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ۞

"মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের রবেরই উপর ভরসা করে। যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।" - সূরা আনফাল (৮) : ২-৪

এখানে সত্যিকার মুমিনদের গুণাবলি কী তা আলোচনা করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা গেল সত্যিকার মুমিন হতে হলে নামায আদায় করতে হবে। নামায ছাড়া সত্যিকার মুমিন হওয়া যাবে না। আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ
هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۞

"নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা তাদের নামাযে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত আদায়কারী, যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসীদের থেকে নয়, কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এ ছাড়া (অন্য

পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। তারাই উত্তরাধিকার লাভকারী, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।" সূরা মুমিনুন : **১-১১**।

এ আয়াতে সফল মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা তাদের নামাযে বিনীত (خٰشِعُوْن)। এ শব্দটি خُشُوْع থেকে নির্গত। خُشُوْع শব্দের অর্থ হচ্ছে বিনয়। কখনো ভয়, প্রশান্তি ও স্থিরতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আসলে এ বিষয়গুলো কাছাকাছি। خُشُوْع কুরআনে একাধিক স্থানে অন্তরের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উপরিউক্ত আয়াতে সাধারণভাবে বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, সফল মুমিন তারা, যারা নামাযে পরিপূর্ণরূপে বিনীত, আন্তরিকভাবেও এবং শারীরিকভাবেও। তাদের বিনয় অন্তর-জগৎকে ছাড়িয়ে দেহ-জগৎকে প্লাবিত করে। তাদের বিনয় ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে বহিরঙ্গকে আলোকিত করে।

বিনয় মানে কী আমরা সবাই জানি- নিজেকে ছোট মনে করা। তো বিনয়ের সঙ্গে নামায পড়ার অর্থ হল নিজেকে ছোট, দুর্বল, অসহায় ও মুখাপেক্ষী মনে করে আর আল্লাহকে সবচেয়ে বড় মনে করে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর সম্মুখে নিজের বন্দেগী নিবেদন করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর জন্য দেহমনের উপস্থিতির বিকল্প নেই।

এই খুশূ-ই হচ্ছে নামাযের রূহ। আসলে খুশূ মুমিনের সবসময়কার অবস্থা। এখানে বিশেষভাবে নামাযের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, নামায হচ্ছে খুশূর প্রকাশের সর্বোত্তম জায়গা।

সফল মুমিনদের দ্বিতীয় গুণ হল তারা তাদের নামাযমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। এই যত্নের মধ্যে সময়মত নামায পড়া, নিয়মিত নামায পড়া এবং নিয়মনীতি, হক ও আদবসমূহ লক্ষ করে নামায পড়া সবই শামিল। অপর সূরায় আল্লাহ নামাযীদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেছেন-

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ۞

"যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত। এবং যাদের সম্পদে আছে নির্ধারিত হক, যাচক ও বঞ্চিতের জন্য। এবং যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি এমন নয় যে, তা থেকে নির্ভয় থাকা যায়। এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তাদের স্ত্রী বা তাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া। কেননা (এ ক্ষেত্রে) তারা নিন্দনীয় নয়। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা আপন সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করে। এবং যারা তাদের নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে। তারা জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে।"
- সূরা মাআরিজ (৭০) : ২৩-৩৫

এখান থেকে আমরা প্রকৃত নামাযীর পরিচয় জানতে পারলাম। প্রকৃত নামাযী হচ্ছে যার মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলি বিরাজমান থাকে, যেগুলোর শীর্ষে রয়েছে নিয়মিত নামায পড়া এবং যত্নের সাথে নামায পড়া। মজার ব্যাপার এই যে, সূরা মুমিনুনে উল্লেখিত সফল মুমিনের সাতটি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সম্পর্কিত। এমনিভাবে সূরা মাআরিজে উল্লেখিত নামাযীর নয়টি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সংক্রান্ত এবং উভয় সূরায় গুণগুলোর আলোচনা শুরু হয়েছে নামায দিয়ে এবং শেষও হয়েছে নামায দিয়েই। এ থেকে অনুমেয়, নামায কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঈমানের সাথে এর কী গভীর সম্পর্ক!

নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ

দুনিয়া হোক বা আখেরাত যে কোনো সুখ, শান্তি, সফলতা ও স্বস্তি লাভে সবরের প্রয়োজনীয়তা অনেক। বিপদাপদে যেমন সবরের প্রয়োজন, তেমনি সৎকাজ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার জন্যও সবরের দরকার। তাই কুরআনে সবরের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিছু আয়াতে সবরের পাশাপাশি নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۞

"হে মুমিনগণ! সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।" - (সূরা বাকারা (২) : ১৫৩)। এখানে আল্লাহ সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় এ দুই বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য নসীব হয়।

পরিবারকে নামাযের নির্দেশদানের তাকিদ

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। এর শিক্ষা ব্যক্তি থেকে নিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সকলের কর্তব্য একে নিজ জীবনে ধারণ করা এবং অন্যকে এর প্রতি আহ্বান করা। এটা ইসলামের সাধারণ নির্দেশ। কুরআনে আমরা দেখি, পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশদানের জন্য তাকিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নবীজীকে লক্ষ করে বলেন-

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى۞

"তুমি নিজ পরিবারকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না। আমিই তো তোমাকে রিযিক দেই। আর শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্য।"
- সূরা ত্বহা (২০) : ১৩২

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রিয় নবী ছিলেন। কুরআনে একাধিক জায়গায় তাঁর আলোচনা রয়েছে। এক জায়গায় আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন-

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۞

"সে নিজ পরিবারকে নামায ও যাকাতের আদেশ করত।" - সূরা মারইয়াম (১৯) : ৫৫

লোকমান হাকীম খ্যাতনামা বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে মূল্যবান নসীহত করেছিলেন। কুরআনে তাঁর নামে একটি সূরা রয়েছে। সেখানে তাঁর কিছু নসীহত উল্লেখ করা হয়েছে। **১৭** নং আয়াতে উল্লেখিত নসীহতগুলি হল-

يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ ؕ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۞

"হে আমার বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে মসিবত আসে তাতে সবর কর। নিশ্চয় এ বড় হিম্মতের কাজ।" - সূরা লোকমান (৩১) : ১৭

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, নিজে যেমন নামায পড়তে হবে, তেমনি পরিবার-পরিজন যেন নামায পড়ে সে ব্যাপারেও সচেষ্ট হতে হবে। প্রথম আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, জীবিকার ব্যস্ততায় নামায থেকে গাফেল হওয়া যাবে না।

আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা নামাযের আদেশ করার পাশাপাশি এ বিষয়টিও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, আমিই রিযিক দেই। এর মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুত এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, আমার হুকুম-আহকাম পালন করে আমার কাছে সাহায্য ও রিযিক প্রার্থনা কর। রোজগারের ফিকিরে আমার হুকুম থেকে উদাসীন হয়ো না।

প্রয়োজনে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার আদেশ

নামাযের জন্য ওযু ফরয। আর ওযুর জন্য পানি আবশ্যক। কিন্তু কখনো এমন হয় যে, কাছে-ধারে পানি নেই বা থাকলেও অসুস্থতার কারণে ব্যবহার করা যায় না। এরকম পরিস্থিতিতে তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

يٰۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۞

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য ওঠ তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধোও এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধোও)। আর যদি তোমরা জানাবত অবস্থায় থাক তবে উত্তমরূপে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও বা সফরে থাক কিংবা তোমাদের কেউ

শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির ইচ্ছা কর এবং তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ কর।" - সূরা মায়েদা (৫) : ৬

এখানে আল্লাহ তাআলা ওযুর বিকল্প ব্যবস্থা দান করেছেন। তা হল তায়াম্মুম। যদি ওযু করার জন্য পানি না পাওয়া যায় অথবা পানি আছে কিন্তু অসুস্থতার কারণে ব্যবহার করা যাচ্ছে না, তাহলে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে হবে। আর মাটি (বা মাটি জাতীয় বস্তু) পাওয়া যায় না এমন স্থান বিরল। তার মানে নামাযে অবহেলার সুযোগ নেই; বরং সময়মত নামায আদায় করতে হবে। আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, সফরেও যথাসময়ে নামায আদায়ে সচেষ্ট হওয়া চাই।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন-

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۭ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

"তিনি (আল্লাহ) জানেন তোমাদের কতক অসুস্থ হবে, আর কিছু সংখ্যক (এমন থাকবে) যারা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমিনে ভ্রমণ করবে এবং কিছু লোক থাকবে, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধরত থাকবে। সুতরাং কুরআন থেকে যতটুকু সহজ হয় ততটুকুই পড় আর নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা যাই সৎকর্ম নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাবে, আল্লাহর কাছে তা উত্তম অবস্থায় এবং অধিক সওয়াবে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" - সূরা মুযযাম্মিল (৭৩) : ২০

এখানে অসুস্থ, মুসাফির ও জিহাদরত ব্যক্তিকে নামায আদায়ের হুকুম করা হয়েছে। তবে সফর, জিহাদ ও অসুস্থতার ওজরের কারণে নামাযে কেরাত যতটুকু সহজ হয় ততটুকু পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা যথাসময়ে আদায় করতে হবে। যত কঠিন অবস্থায়ই আসুক নামায ছাড়া যাবে না। এখানে যে অবস্থাগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলোই কঠিন। কঠিন হওয়ার কারণেই কেরাতের বিষয়টি সহজ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে-

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

"নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে ফরয।" - সূরা নিসা (৪) : ১০৩

নামাযকে আল্লাহর জন্য নিবেদনের নির্দেশ

যে কোনো কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য করা চাই। আল্লাহর জন্য করলে আল্লাহ খুশি হন এবং বান্দাকে দুই হাত ভরে প্রতিদান দেন।

আল্লাহ তাআলা নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ۞

"তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই আদেশ করা হয়েছে এবং আমিই প্রথম আনুগত্যকারী।" - সূরা আনআম (৬) : ১৬২-১৬৩

এখানে নবীজীকে নিজের নামায, কুরবানী ও জীবন-মরণ আল্লাহর জন্য নিবেদন করার আদেশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুত তাঁর বান্দাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তারা যেন তাদের সমস্ত কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য করে।

লক্ষণীয় হল এখানে সবার আগে নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় নামায বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ।

নামায মুত্তাকীদের গুণ

যে আল্লাহকে ভয় করে চলে তাকে মুত্তাকী বলে। আল্লাহর কাছে মুত্তাকীগণ সবচেয়ে সম্মানিত। কুরআন মুত্তাকীদের একটি গুণ এই উল্লেখ করেছে যে, তারা নামায কায়েম করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

الٓمّٓ، ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ، وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ، اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۞

"আলিফ-লাম-মীম। এ কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই; এ মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত- যারা অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা তার প্রতি ঈমান রাখে, যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে আর তারা আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম।" - সূরা বাকারা (২) : ১-৫

এখানে মুত্তাকীদের ৬টি গুণ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম গুণ হল তারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখে। দ্বিতীয় গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় ঈমানের পরই নামাযের স্থান এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য নামায আবশ্যক।

নামায মুহসিনীনের বৈশিষ্ট্য

যে ব্যক্তি সৎ, সুন্দর ও অনুগ্রহের আমল করে তাকে মুহসিন বলা হয় (মুহসিন শব্দের বহুবচন মুহসিনূন)। আল্লাহ মুহসিনীনকে ভালবাসেন। কুরআনে তিনি তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করেছেন যে, তারা নামায আদায় করে।

আল্লাহ বলেন-

الٓمّٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۙ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۞

"আলিফ-লাম-মীম। এ হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত; যা হেদায়েত ও রহমত মুহসিনীনের জন্য, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম।" - সূরা লুকমান (৩১) : ১-৫

এখানে মুহসিনীনের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায আদায় করে। এটা নির্দেশ করে, নামায খুবই মর্যাদাপূর্ণ এবং মুহসিনীনের দলভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এর বড় ভূমিকা রয়েছে।

নামায মুখবিতীনের গুণ

যে আল্লাহর সামনে বিনীত, আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং আল্লাহর ব্যাপারে প্রশান্তচিত্ত তাকে মুখবিত বলে (মুখবিত শব্দের বহুবচন মুখবিতূন)। এরা আল্লাহর একান্ত আপন। কুরআনে তাদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۞

"আর সুসংবাদ দাও মুখবিতীনকে, যাদের অন্তর আল্লাহকে স্মরণ করা হলে ভীত হয়, যারা তাদের উপর আপতিত বিপদে সবর করে এবং যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" - সূরা হজ (২২) : ৩৪-৩৫

এ আয়াতে মুখবিতীনের ৪টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা যায়, নামায মহিমান্বিত আমল এবং মুখবিতীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এর বিরাট অবদান রয়েছে।

কুরআন আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার কুরআনের প্রতি ঈমান আনা এবং একে দৃঢ়ভাবে ধরার কথা বলেছেন। এক আয়াতে কুরআনকে আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের কথাও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ۞

"আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে ও নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সংশোধনকারীদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।" - সূরা আরাফ (৭) : ১৭০

কুরআনকে মজবুতভাবে ধরার সাথেই নামাযের কথা এসেছে। কেননা নামায কুরআনের অন্যতম সুস্পষ্ট বিধান। তারপরও পৃথকভাবে নামাযের কথা বলা এর অধিক গুরুত্ব বুঝায়। এটা নির্দেশ করে, নামায আদায় করা কুরআনকে ধারণের অংশ। নামায ছাড়া কুরআন আঁকড়ে ধরা অপূর্ণ।

নেক আমলের সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

কুরআনে বহু জায়গায় ঈমান ও নেক আমলের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এক স্থানে নেক আমলের সঙ্গে নামাযের কথাও বলা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۞

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, নামায কায়েম করেছে ও যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আপন রবের কাছে তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কোনো দুঃখও পাবে না।" - সূরা বাকারা (২) : ২৭৭

নেক আমলের ভেতর নামায রয়েছে। তা সত্ত্বেও আলাদাভাবে নামাযের কথা বলা ইঙ্গিত করে, নামায সমস্ত নেক আমলের শীর্ষে।

তওবার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল জাযিরাতুল আরব থেকে মূর্তিপূজার মূলোচ্ছেদ করা, যাতে সেখানে কোথাও মূর্তিপূজার চিহ্নমাত্র না থাকে। এজন্য আরবের যেসকল মূর্তিপূজক অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে অবকাশ দেওয়া হয়, যাতে এর ভেতর তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। অন্যথায় তাদের জাযিরাতুল আরব ছাড়তে হবে, নয়তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে। আল্লাহ বলেন-

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۞

"অতঃপর যখন সম্মানিত মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করবে। তাদের পাকড়াও করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ওঁৎ পাতার স্থানে তাদের জন্য বসে থাকবে। তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" - সূরা তাওবা (৯) : ৫

সামনে গিয়ে বলেছেন-

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ۞

"তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।" - সূরা তাওবা (৯) : ১১

আয়াত দুটিতে মুশরিকরা নিরাপদে থাকা এবং মুসলিমদের দ্বীনী ভাই গণ্য হওয়ার জন্য শিরিক থেকে তওবা করার সঙ্গে নামায ও যাকাত আদায়ের শর্তারোপ করা হয়েছে। এ থেকে অনুমেয় নামায ও যাকাত কত গুরুত্বপূর্ণ!

নামাযের প্রতিবন্ধককে নিষিদ্ধ করা

আল্লাহ তাআলা সূরা মায়েদায় মদ ও জুয়াকে পরিষ্কারভাবে হারাম করেছেন। পাশাপাশি এগুলোর কিছু ক্ষতিকর দিকও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন-

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ۝

"শয়তান তো চায় মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে। সুতরাং তোমরা কি (ওসব জিনিস থেকে) নিবৃত্ত হবে?" - সূরা মায়েদা (৫) : ৯১

এখানে মদ ও জুয়ার একটি ক্ষতিকর দিক এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা মানুষকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর যিকিরের মধ্যে নামায অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারপরও পৃথকভাবে নামাযের কথা বলা এর বিশেষ গুরুত্ব বুঝায়। এটা নির্দেশ করে, এমন কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না, যা নামাযের পথে অন্তরায় হয়।

বংশধরের নামাযী হওয়ার জন্য ইবরাহীম (আ.)-এর দুআ

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর খলীল ছিলেন। কুরআনে বহু স্থানে তাঁর আলোচনা এসেছে। তাঁর নামে কুরআনে একটি সূরাও রয়েছে। সেখানে আমরা দেখি, আল্লাহর কাছে তিনি এ দুআ করেছেন-

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ۝

"হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আর তুমি আমার দুআ কবুল কর।" - সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সপরিবারে শামে বসবাস করতেন। একসময় স্ত্রী হাজার (হাজেরা শব্দটি ভুল) ও শিশু পুত্র ইসমাঈলকে শাম থেকে মক্কায় নিয়ে আসলেন এবং কাবা ঘরের কাছে রেখে গেলেন। অথচ মক্কায় তখন না জনবসতি ছিল, না জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে কেন সেখানে রেখে গেলেন? কুরআনের ভাষায় শুনুন-

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ۝

“হে আমাদের রব! আমি আমার কতিপয় সন্তানকে তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে শস্যহীন উপত্যকায় (এনে) বসবাস করিয়েছি। হে আমাদের রব! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং তাদেরকে ফলমূল থেকে রিযিক দান কর, হয়তো তারা শোকর করবে।” - সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৭

আল্লাহ কুরআনে তাঁর খলীলের এই দুআ উল্লেখ করে মূলত নিজ বান্দাদের উৎসাহিত করছেন তারা যেন নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরের নামাযের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়, আল্লাহর কাছে দুআ করে। তাদের জন্য সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা করে, যেখানে তারা নামায কায়েম করতে পারবে, দ্বীনের উপর সুন্দরভাবে চলতে পারবে।

যারা নামায থেকে গাফেল নয় আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন

আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন মূলত আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের জন্য। সেইসঙ্গে দুনিয়াতে স্বাভাবিক চলার মত উপায়-উপকরণ সংগ্রহের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। তবে সতর্ক থাকতে হবে দুনিয়ার উপকরণ যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। কিছু সৌভাগ্যবান মানুষ এমন আছেন, যারা আল্লাহর এ নির্দেশনা অনুযায়ী চলেন। কুরআনে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ، رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ۞

“সেই ঘরসমূহে, যেগুলোকে সমুন্নত করতে ও যেখানে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে- এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল করে না।”
- সূরা নূর (২৪) : ৩৬-৩৭

এখানে আল্লাহ তাঁর ওই বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁর হেদায়েতের নূর অর্জন করেছে। তারা মসজিদ ও ইবাদতখানায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। তাঁর যিকির করে। তাঁর ইবাদত করে। তাঁর হুকুম অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বেচাকেনাও করে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর স্মরণ, নামায ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল হয়ে যায় না।

আল্লাহর স্মরণের মধ্যে নামাযের কথা এসে গেছে। তারপরও ভিন্নভাবে নামাযের কথা উল্লেখ করা- এর বিশেষ গুরুত্ব বুঝায়। এটা আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, নামায থেকে গাফেল হওয়া যাবে না।

নামায মুহাজিরদের অনন্য বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা কুরআনে মুহাজির সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন। এক আয়াতে তাঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۞

"(তারা এমন যে) আমি যদি তাদেরকে যমিনে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।"
- সূরা হজ (২২) : ৪১

দুনিয়াদার লোকদের ক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা যায়, তারা নির্যাতিত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন হলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে পড়ে। ক্ষমতা দানকারী আল্লাহকে ভুলে যায়। কিন্তু মুহাজির সাহাবীগণ এমন নন; বরং তাঁদের বৈশিষ্ট্য হল, আল্লাহ যদি তাঁদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করেন, তবে তাঁরা নামায কায়েম করবেন। যাকাত প্রদান করবেন। সৎকাজের আদেশ করবেন। অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন। অর্থাৎ রাজত্ব পেয়ে তাঁরা আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে যাবেন না। বরং আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলবেন, দ্বীন চর্চা করবেন।

লক্ষণীয় হল, এখানে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নামায সাহাবীদের বিশেষ গুণ

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি অনেক। কুরআনে তাঁদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রশংসা করে বলেছেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫
سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۞

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সঙ্গে আছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর, পরস্পরের প্রতি সদয়। তুমি তাদেরকে দেখবে রুকু ও সেজদারত অবস্থায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে। তাদের পরিচয় তাদের চেহারায় (পরিস্ফুট) সেজদার প্রভাবে।" - সূরা ফাতাহ (৪৮) : ২৯

এখানে সাহাবীদের তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় গুণ হল তারা অধিক পরিমাণ রুকু-সেজদা করে তথা নামায পড়ে। তারা এত বেশি নামাযে মগ্ন থাকে যে, তুমি চাইলেই তাদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পারবে। সাহাবীদের সম্পর্কে এখানে আরো বলা হয়েছে, তাদের পরিচয় তাদের চেহারায় (পরিস্ফুট) সেজদার প্রভাবে। অর্থাৎ অধিক পরিমাণ রুকু-সেজদা ও নামাযের ফলে তাঁদের চেহারায় বিশেষ ধরনের নূর, জ্যোতি ও উজ্জ্বলতা বিরাজ করে।

আল্লাহর ভয়, খুশূ-খুযূ ও ইখলাসের আভা যেন ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে তাঁদের বহিরঙ্গকে উদ্ভাসিত করে। এই গুণাবলির জন্য সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করা থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তাআলা এগুলো পছন্দ করেন এবং তিনি চান তাঁর বান্দারা তা অর্জন করুক।

নামাজের ফায়দা বা ফজিলত

দুনিয়ার ভালো-মন্দ কর্মগুলো আখিরাতে পরিমাপ করা হবে। দুনিয়ায় যারা বেশি বেশি নেক আমল করবে। তারা কিয়ামতের কঠিন সময়ে সফলকাম হবে। কিয়ামত দিবসে পরিবার-পরিজন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। প্রত্যেকে নিজের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সে দিন শুধু দুনিয়ার নেক আমলের ওপর ভরসা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ পাককে ভয় করো, প্রত্যেকের উচিত লক্ষ করা যে, আগামীকালের জন্য সে কি পেশ করতে যাচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো; অবশ্যই তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ পাক তার পূর্ণাঙ্গ খবর রাখেন।' (সূরা হাশর: ১৮)।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কুরত (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত রাসূল (সা:) এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেয়া হবে।

যদি নামাজ ঠিক থাকে তবে অন্যান্য আমলও সঠিক বলে প্রমাণ হবে। আর যদি নামাজের হিসাবে গরমিল হয়, অন্যান্য আমলও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যাবে।' (তিরমিজি: ৪১৩, আবু দাউদ: ৮৬৪)।

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়া'লা নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিদের প্রতিদান দেবেন। যারা দুনিয়াতে নামাজ কায়েম করেছে, যাকাত প্রদান করেছে, সে দিন তারা আনন্দ-উল্লাস করতে থাকবে। তাদের জাহান্নামের কোনো ভয় থাকবে না। আর দুনিয়ার বেনামাজিরা, সে দিন হা-হুতাশ করতে থাকবে। কুরআনে এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও। আর তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে।' (সূরা বাকারা: ১১০)।

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না।' (সূরা ফাতির: ২৯)।

পরকালে সাফল্যে লাভের চাবিকাঠি হলো নামাজ আদায় করা। পরকালে নাজাত পেতে হলে, দুনিয়ার জিন্দেগিতে নামাজের প্রতি যত্নবান হতে হবে। নামাজি ব্যক্তিরাই জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হবেন।

কুরআনে এরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই ওই সব ঈমানদার সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাজে খুশু-খুজুর সাথে আদায় করে।' (সূরা মুমিনুন: ১-২)।

'যারা নিজেদের সালাতের হেফাজত করে, এরাই আল্লাহর জান্নাতে মর্যাদাসহকারে প্রবেশ করবে।' (সূরা মা'আরিজ : ৩৪-৩৫)।

'যারা তাদের সালাতসমূহের হিফাজতকারী, মূলত এরাই হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী এবং সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।' (সূরা মুমিনুন: ৯-১১)।

যারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, তাদের আমলনামায় কোনো গোনাহ থাকবে না। নামাজ বান্দার আমলনামা থেকে গোনাহগুলোকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল (সা:) এরশাদ করেছেন, 'তোমরা বলতো, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে একটি নহর থাকে যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সাহাবারা উত্তরে বললেন: না, কোনো ময়লাই অবশিষ্ট থাকবে না। অতঃপর রাসূল (সা:) বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্ত এমনই। এর বিনিময়ে আল্লাহ পাক নামাজির সব গোনাহ মাফ করে দেন।' (বুখারী: ৫০৩)।

নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে অবহেলা করলে, আখিরাতে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। হযরত নাওফেল ইবনে মুয়াবিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল (সা:) এরশাদ করেছেন, 'যার এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে গেল তার যেন ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজন ও ধন-দৌলত সবকিছু ছিনিয়ে নেয়া হলো।' (ইবনে হিব্বান-৪: ৩৩০ পৃ.)।

নামাজের গুরুত্ব এতটাই যে, মুসলমান ও অন্য ধর্মের লোকদের মধ্যে পার্থক্যই হলো নামাজ। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল (সা:) এরশাদ করেছেন, 'মানুষের শিরক এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্য নামাজ ছেড়ে দেয়া।' (মুসলিম: ২৪৭)।

হযরত হানজালা উসাঈদী (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল (সা:) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথ পাবন্দীর সাথে আদায় করে, উত্তমরূপে অজু করে, সময়ের প্রতি খেয়াল রাখে, রুকু-সিজদা ঠিকমতো আদায় করে এবং এভাবে নামাজ আদায়কে নিজের ওপর আল্লাহ তায়ালার হক মনে করে, তবে জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দেয়া হবে।
(মুসনাদে আহমাদ-৪: ২৬৭ পৃ.)।

নামাজের ইহকালীন ও পরকালীন উপকারিতা

দুনিয়া ও আখিরাতে নামাজের অনেক উপকারিতা রয়েছে, নিম্নে সংক্ষেপে কতিপয় উল্লেখ করা হলো:

১। সালাত বা নামাজ হিফাযত অর্থাৎ সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

২। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল তার জন্য সালাত জ্যোতি ও প্রমাণ হবে: অর্থাৎ সালাত তার ঈমানের দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কারণ হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে সালাতের হিফাযত করল সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

৩। সালাত বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب۩

"আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।" [সূরা আল-'আলাক, আয়াত: ১৯]

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো'আ কর।" (সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ)

সালাতই হচ্ছে বান্দার ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক গড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। অতএব, আপনি যদি চান তবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে (সালাতের মাধ্যমে) বেশি-বেশি সাজদাহ ও রুকুর মাধ্যমে এ সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে বেশি-বেশি দো'আ করার ওসীয়ত করেছেন।

৪। সালাত গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফফারা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।"(সহীহ মুসলিম)

উক্ত হাদীসের শেষ অংশের দিকে লক্ষ্য করুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন: “যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে” কেননা কবীরা গুনাহ খাঁটি ও আন্তরিক তাওবা ব্যতীত মাফ হবে না।

৫। সালাত সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি?

তিনি বলেন, “সময়মত সালাত আদায় করা”। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, “পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা”। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: “আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৬। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষুশীতলতা: আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾

“জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾

“আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, “উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।” (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।” (সুনান নাসাঈ)

৭। সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।” (মুসনাদে আহমদ) সাবেত রহ. বলেন, “নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾

"নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

সালাতে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয় তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তার না কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে-আপদে চিনবে।" (মুসনাদে আহমদ)

অবশ্য কেউ যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাতের হিফাযতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তবে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

৮। সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ , الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

"অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।" [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২]। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ , وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।" [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫]

আয়াতে উল্লিখিত "ফালাহ" শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়।

৯। সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً , نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

"এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।" [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১৩২]

ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর এমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে না।"

১০। সালাত আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা: সালাত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দূর্গ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ﴾

"তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" [সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৪৫]

অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেই সালাতের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায় আসক্ত না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের পিতা-মাতাকে এরই ওসীয়ত করেন এবং বলেন, "যখন তোমাদের সন্তান সাত বছরের হয় তখন তাদেরকে সালাতের আদেশ কর এবং যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে সালাতের জন্য (ত্যাগ করলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও"। (সুনান আবু দাউদ)

১১। সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে: অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা-হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعٗا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ﴾

"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।" [সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]

১২। সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ. فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي عَهْدِهِ. فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ. عَلَى وَجْهِهِ»

“যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।” (সহীহ মুসলিম)

১৩। সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা‘আলার ভালবাসা অর্জন হয়: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ۝

“আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত।

১৪। শারীরিক উপকারিতা: সালাত এমন একটি ইবাদাত যার মাধ্যমে শরীর চর্চার অধিকাংশ উপকারিতাই পাওয়া যায়। যথাযথভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে ফুসফুস, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, মাংসগ্রন্থি, ঘাড় ইত্যাদি অঙ্গের রোগের উপকার পাওয়া যায়। স্নায়ুবিক দুর্বলতা ও জোড়ায় ব্যথ্যা সারানোর জন্য চিকিৎসকরা সালাত আদায়ের পরামর্শ দেন। এ কথা সত্য যে, সালাতে সিজদার সময় মস্তিষ্কতন্ত্রী, চোখ ও মাথাসহ অন্যান্য অঙ্গে রক্তপ্রবাহ পরিমিত পর্যায়ে থাকে। ফলে চোখের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও মস্তিষ্ক প্রখর হয়। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমাদের শরীরকে সচল ও কার্যকর রাখা নিশ্চিত করে। আলস্য বা কর্মবিমুখতা দূর হয়। তবে সালাতের মূল উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর প্রতি আত্ম-নিবেদন।

১৫। মানসিক উপকারিতা: বর্তমানে মানুষের অশান্তির মূল কারণ হলো মানসিক অস্থিরতা। এই অস্থিরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সারা বিশ্বে গবেষণা হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধ্যান (Medi- tation) কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সালাত হলো এক উন্নতমানের ধ্যান (Meditation)। কেউ যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন ও আমার সব অবস্থা জানেন, তাহলে তার কোনো প্রকার হতাশা থাকতে পারে না। এ ছাড়া মহানবি (সা.) যখন কোনো পেরেশানিতে ভুগতেন তখন তিনি হযরত বেলাল (রা.)-কে বলতেন ‘হে বেলাল, সালাতের ব্যবস্থা করে (আযান দিয়ে) আমাদের শান্তি দাও।' (আবু দাউদ) বস্তুত মানুষের শরীর ও মন এক অপরের পরিপূরক। সালাত আদায়ের মাধ্যমে মন উৎফুল্ল থাকে।

১৬। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপকারিতা: মসজিদ হলো মহান আল্লাহ তা'আলার ঘর, যেখানে দৈনিক পাঁচবার সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করা হয়। সেখানে ধনী-গরিব কোনো ভোদাভেদ থাকে না। সকলে স্ব স্ব পদমর্যাদা ভুলে মহান আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়। একে অপরের খোঁজ-খবর নিয়ে সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়ায়। ফলে মুসলিম সমাজের বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

সালাত আদায়ের মাধ্যমে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। আর নিয়মিত সালাত আদায় করলে সমাজ হতে অপসংস্কৃতি দূর হয়।

নিশ্চয়ই নামাজ অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে

ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো নামাজ। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُه۞

"কিয়ামত দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাজের মাধ্যমে।"
[মুসনাদে আহমাদ, হাদীসঃ ১৬৯৪৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীসঃ ৮৬৬]

হযরত উমর (রা.)- এর প্রসিদ্ধ বাণী-

إِنّ أَهَمّ أَمْرِ كُمْ عِنْدِي الصّلَاةُ. فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ. وَمَنْ ضَيّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ۞

"নিশ্চয়ই আমার কাছে তোমাদের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামাজ। যে ব্যক্তি নামাজের হেফাযত করল, যত্ন সহকারে তা আদায় করল, সে তার দ্বীনকে হেফাযত করল। আর যে তাতে অবহেলা করল, (দ্বীনের) অন্যান্য বিষয়ে সে আরো বেশি অবহেলা করবে।" - মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬; মুসান্নাফে আবদুর রযযাক, বর্ণনা ২০৩৮

নামাজ মূলত খোদাপ্রদত্ত এক মহান নিআমত। রাব্বুল আলামীনের এক বিশেষ উপহার, যা বান্দাকে সকল প্রকার অশ্লীলতা, পাপাচার, প্রবৃত্তিপূজা, ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের অন্ধ মোহ থেকে মুক্ত করে পূত-পবিত্র ও উন্নত এক আদর্শ জীবনের অধিকারী বানিয়ে দেয়। বিকশিত করে তোলে তার ভেতরের সকল সুকুমারবৃত্তি। তার জন্য খুলে দেয় চিরস্থায়ী জান্নাতের সুপ্রশস্ত দুয়ার। নামাজ হচ্ছে হিকমাহপূর্ণ এক অলৌকিক তরবিয়ত-ব্যবস্থা। সালাতের মাধ্যমেই ইখলাস, আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিলোপের মহৎ গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, যা বান্দাকে পৌঁছে দেয় আল্লাহর সান্নিধ্যের স্বর্ণশিখরে।

নামাজ এমন এক নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পূর্ণ যে, খাঁটি মুসল্লি নামাজের বাইরের পরিবেশেও এমন কোনো কাজ করতে পারে না, যা মানুষের দৃষ্টিতে নামাজের ভাব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। অদৃশ্য থেকে মূলত নামাজই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে তার রাত-দিনের সকল গতিবিধি। শয়তানের ধোঁকায় যদি মুসল্লি কখনো কোনো অন্যায় বা অশোভনীয় কাজে লিপ্ত হতে চায় তখন নামাযের তরবিয়তে দীক্ষিত বিবেক তাকে বলে, তুমিই বল, একটু পরে যখন তুমি নামাজে তোমার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়াবে তখন কি তোমার এই ভেবে লজ্জাবোধ হবে না যে, কেমন কালো মুখ ও কলুষিত হৃদয় নিয়ে তুমি

আপন মালিকের সামনে দাঁড়াচ্ছ? যিনি অন্তর্যামী, তোমার গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। যিনি ছাড়া তোমার আর কোনো ইলাহ নেই। যিনি তোমার একমাত্র আশ্রয়দাতা, যাঁর সামনে তোমাকে বার বার দাঁড়াতে হবে। যার কাছে তোমার সকল চাওয়া-পাওয়া। প্রতিটি মুহূর্তে তুমি যাঁর মুখাপেক্ষী। এগুলো জানার পরও কি তুমি তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হবে? নামাজ এভাবে মুসল্লিকে উপদেশ দিতে থাকে এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁধা দেয়। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা-

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ۞

"নিশ্চয়ই নামাজ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।" - সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫

ইমাম তবারী, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আলূসীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারের মত অনুসারে আয়াতের মর্ম হল, তাকবীর, তাসবীহ, কেরাত, আল্লাহর সামনে কিয়াম ও রুকু-সিজদাহসহ অনেক আমলের সমষ্টি হচ্ছে নামাজ। এ কারণে নামাজ যেন মুসল্লিকে বলে, তুমি কোনো অশ্লীল বা অন্যায় কাজ করো না। তুমি এমন প্রভুর নাফরমানী করো না, যিনি তোমার কৃত ইবাদতসমূহের প্রকৃত হকদার। তুমি এখন কীভাবে তাঁর অবাধ্য হবে, অথচ তুমি এমন আমল করেছ, যা তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্বকে প্রকাশ করে। এরপরও যদি তাঁর অবাধ্য হও তবে এর মাধ্যমে তুমি স্ববিরোধী কাজে লিপ্ত হলে। (আর স্ববিরোধী কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি কোন্ স্তরে নেমে আসে সেটা তোমার ভালোই জানা আছে।) - রুহুল মাআনী, ১০/৪৮২। প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্ত নামাজে প্রতি রাকাতে বান্দাহ বলতে থাকে-

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۞

[(তুমি) কর্মফল-দিবসের মালিক।]

আর তার স্মরণ হতে থাকে, তাকে কাল কর্মফল দিবসে মালিকের সামনে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং তাঁর নাফরমানী থেকে, তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে হবে। কোনো গুনাহ যদি নামাযের আগে হয় তাহলে তার গুনাহের কথা স্মরণ হয় ও লজ্জাবোধ হয়; বান্দা অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করে। তেমনি যদি কোনো গুনাহের নিয়ত থাকে তখন বান্দার মনে হয়, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো; কাল কিয়ামতের দিনও তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। তাহলে কীভাবে আমি নামাজের পর অমুক গুনাহ করার কথা ভাবতে পারি! এভাবে নামায বান্দাকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে, কৃত গুনাহ থেকে পবিত্র করে। তেমনিভাবে আমরা নামাজের শুরুতে যে ছানা পড়ি-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ...

এখানে পড়ার আরেকটি দুআও রয়েছে, যে দুআর মধ্যে বান্দা গুনাহ থেকে দূরে থাকার তাওফীক প্রার্থনা করে-

اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۞

(হে আল্লাহ! পূর্ব-পশ্চিমের যেমন দূরত্ব; আমার মাঝে আর গুনাহের মাঝে তুমি তেমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও।)

তো বান্দা যখন নামাজে দাঁড়িয়ে এ কথা বলে, তখন অবচেতনেই সে গুনাহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন এবং তাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করেন। এভাবে নামাজ বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে।

দিনের শেষে বিত্র নামাজে আমরা দুআ কুনূত পড়ি। সে দুআতে এমন অনেক বাক্য রয়েছে, যাতে বান্দা নিজ গুনাহের কথা স্মরণ করে, মাফ চায়, গুনাহ না করার সংকল্প করে। যেমন দুআর শুরুতেই আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বান্দা বলে-

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ...

(ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।)

দিন শেষে বান্দা যখন গফূরুর রহীমের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তো বান্দার সারাদিনের সকল পাপের কথা স্মরণ হয়ে যায়। সাথে ভবিষ্যতে পাপ না করার সংকল্প ব্যক্ত করে। কারণ, কৃত গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য প্রধান শর্তই হল, ভবিষ্যতে এ গুনাহ আর না করার সংকল্প।
একপর্যায়ে বান্দা বলে-

نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ...

(আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি; অকৃতজ্ঞ হই না।)
রবের নাফরমানীর চাইতে বড় অকৃজ্ঞতা আর কী হতে পারে! সালাত বান্দাকে শুধু রবের নাফরমানী থেকেই বিরত রাখে না; বরং নাফরমান থেকেও দূরে রাখে। দুআ কুনূতে বান্দা বলে-

وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ...

(যে তোমার নাফরমানী করে আমরা তাকে ত্যাগ করি, বর্জন করি।)

সবশেষে বান্দা সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সংকল্প ব্যক্ত করে বলে-

وَنَخْشٰى عَذَابَكَ...

(আমরা তোমার আযাবকে ভয় করি।)

এ সংকল্প সারাদিন বান্দাকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কৃত গুনাহ থেকে তওবা করার তাকিদ দেয়। এভাবেই গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা, গোনাহগার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সংকল্প আর আল্লাহর আযাবের স্মরণ বান্দাকে সকল প্রকার অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।
এ তো গেল দিনের শেষে বান্দার গুনাহের স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনার কথা; এ ছাড়াও প্রতি নামাজের শেষেই তো বান্দা বলে-

اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ إِلاَ أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرّحِيم۞

ইয়া আল্লাহ! আমি (তোমার নাফরমানীর মাধ্যমে) নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। আর আপনি ছাড়া গুনাহ মাফকারী আর কেউ নেই। আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই ক্ষমাকারী, করুণাময়।

যে বান্দা রবের সামনে দাঁড়িয়ে বারবার 'যলামতু নাফসী'-'নিজের উপর যুলুম করেছি' বলে স্বীকারোক্তি দেয় এবং হৃদয়ে তা ধারণ করে সে কি নামাজের বাইরে এ স্বীকারোক্তির বিপরীত করতে পারে? রব্বে কারীমের, গফূরুর রহীমের নাফরমানী করতে পারে?এভাবেই নামাজ বিরত রাখে বান্দাকে সকল অন্যায়-অনাচার থেকে।

সবচেয়ে বড় কথা হল, দিনের পাঁচটি সময়ে পাঁচবার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়ানোই তো বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট। দিবস-রজনীর বিভিন্ন মুহূর্তে সে যত গুনাহ করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই তার গুনাহের কথা স্মরণ হয়ে যায়, সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। কারণ সে তো দাঁড়িয়েছে 'আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি'র সামনে, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব জানেন। সে তো দাঁড়িয়েছে 'আলীমুম বিযা-তিস সুদূর'-এর সামনে, যিনি অন্তরের সংকল্পও জানেন।

এর দ্বারা যেমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পাথেয় অর্জন হয়, সংকল্প করার তাওফীক হয় তেমনি এ কারণে গুনাহও মাফ হয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

اَلصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُن۞

"পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাজ তার মাঝের গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়।" - সহীহ মুসলিম, হাদীসঃ ২৩১

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করল, অমুক ব্যক্তি রাতে নামাজ আদায় করে আর দিনের বেলায় চুরি করে। নবীজী বললেন-

سَيَنْهَاهُ مَا تَقُول۞

"তুমি যা বলছ (অর্থাৎ তার নামাজ) তা শীঘ্রই তাকে (এ অন্যায় থেকে) বিরত রাখবে।"
- মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৭৭৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীসঃ ২৫৬০

এক ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে নামাজ আদায় করত। যখন তার সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.),-কে বলা হল, তিনি বললেন, নামাজ তার জন্যই ফলদায়ক হয়, যে নামাজের আনুগত্য করে। অতপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন-

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ۞

"নিশ্চয়ই নামাজ অশোভন ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।" [সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫]

- মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীসঃ ৩৫৬৯৬; তাফসীরে তাবারী, ১৮/৪০৮; তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ৯/৩০৬৬

হযরত শুআইব (আ.)-এর ঘটনা থেকেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝে আসে- নামাজ অন্যায় থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর নবী হযরত শুআইব (আ.) যখন তাঁর জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং মাপে কম দেয়াসহ সকল প্রকার অনাচার পরিহার করে পূত-পবিত্র জীবন যাপনের আহ্বান জানালেন তখন তাঁর অবাধ্য সম্প্রদায় তার প্রতি আপত্তি জানিয়ে বলল-

اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ۞

"তোমার 'সালাত' কি তোমাকে এই নির্দেশই দেয় যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের উপাস্য বস্তুকে ত্যাগ করব কিংবা আমরা বিরত থাকব আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা থেকে? তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান ও ধার্মিক লোক!" [সূরা হূদ (১১) : ৮৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সুফিয়ান (রহ.) বলেন, আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই সালাত (ভালো কাজের) আদেশ এবং (মন্দ কাজ থেকে) নিষেধ করে। - তাফসীরে তাবারী ১৮/৪০৯

নামাজ কখন অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে?

প্রকৃত অর্থেই নামাজ মুসল্লিকে অন্যায় ও অশোভন কাজ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু তা কখন? এ ঘোষণার চূড়ান্ত ফল লাভ করার জন্য কোনো শর্ত রয়েছে কি না? এক্ষেত্রে মুসল্লিরও কিছু করণীয় ও বর্জনীয় আছে কি না? এটা অবশ্যই যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। অনেক আয়াত ও হাদীস থেকেই এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। এখানে শুধু একটি আয়াত ও একটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ۞

"দুর্ভোগ ঐসকল মুসল্লির, যারা তাদের নামাজ থেকে উদাসীন। যারা শুধু (মানুষদেরকে) দেখানোর জন্য নামাজ আদায় করে।" - সূরা মাউন (১০৭) : ৪-৫

অতএব স্পষ্ট যে, মুসল্লি মাত্রই নামাজের এই মহা সুফল লাভ করবে, বিষয়টি এমন নয়। নামাজের মধ্যে উদাসীনতা মুসল্লির জন্য সুফল নয়; বরং কুফল বয়ে আনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ۞

"আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে এবং যথাসময়ে সালাত আদায় করবে- এভাবে যে, রুকু-সিজদা ও খুশূ পূর্ণরূপে সম্পাদন করবে, তার জন্য আল্লাহ পাক ক্ষমার (অন্য বর্ণনায়, জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি

(এসব) করবে না তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা হলে মাফ করবেন নতুবা শাস্তি দিবেন।" - মুসনাদে আহমাদ, হাদীসঃ ২২৭০৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীসঃ ৪২৫

নবীজীর এই পবিত্র ইরশাদ থেকে বোঝা যায়, নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে একটি 'আহ্দ' বা চুক্তি সম্পাদিত হয়। আর সে চুক্তিটি একটু বিস্তর। এর জন্য কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে, যার অন্যতম হল, নামাজে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করা এবং রুকু-সিজদা ধীরস্থির ও যথাযথভাবে সম্পাদন করা। মূলত নামাজের গুণগত মান হিসাবেই তা মুসল্লিকে পাপাচার ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا نِصْفُهَا۞

"নিশ্চয়ই বান্দা নামাজ সম্পন্ন করে আর তার জন্য লেখা হয় নামাজের দশ ভাগের এক ভাগ (প্রতিদান) অথবা নয় ভাগের এক ভাগ অথবা আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ অথবা সে পায় নামাজ অর্ধেক (প্রতিদান)। এক বর্ণনায় এসেছে অথবা সে পায় নামাজের পূর্ণ প্রতিদান ও সুফল।" - মুসনাদে আহমাদ, হাদীসঃ ১৮৮৯৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীসঃ ৭৯৬

অর্থাৎ যদি নামাজটি আদায় করা হয় পূর্ণ খুশূ-খুযূর (হৃদয়ের একাগ্রতা ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের স্থিরতার) সাথে এবং তিলাওয়াত ও তাসবীহসমূহও পাঠ করা হয় যথাযথভাবে। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও আদবসমূহও সম্পাদন করা হয় উত্তমরূপে। তবে সেই মুসল্লিকে আখেরাতে পূর্ণ প্রতিদান ও সওয়াব দান করা হবে এবং দুনিয়াতে তা মুসল্লিকে মন্দ ও অশোভন কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। পক্ষান্তরে যে নামাজ হয় অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিকতা, যা সীমাবদ্ধ থাকে নিছক অঙ্গ-প্রতঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে, যাতে রুকু-সিজদা, কিরাত-কিয়াম যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয় না সেই নামাজ কীভাবে মুসল্লিকে অন্যায় ও অশোভন কাজ থেকে বাঁচাবে? তার নামাজ তো তাকে নামাজরত অবস্থাতেই অশোভন কাজ ও চিন্তা থেকে ফিরাতে পারছে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ۞

"সফলকাম সেসকল মুমিন, যারা সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করে।" - সূরা মুমিনূন (২৩) : ১-২

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পরিচয় দিতে গিয়ে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ۞

"তাদের লক্ষণ তাদের মুখমন্ডলে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে।" - সূরা ফাতাহ (৪৮) : ২৯

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ (রাহ.) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন-

ليس بهذا الأثر الذي في الوجه ولكنها الخشوع۞

"এখানে কপালে সেজদার দাগ উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হল, 'খুশূ'।" - ওয়াকী ইবনুল র্যারাহ, আয্যুহদ ২/৫৯৮, হাদীস ৩২৭; তাফসীরে সুফিয়ান ছাওরী পৃ. ২৭৮; ইবনুল মুবারক, আয্যুহদ পৃ. ৮৯

আল্লামা আলূসী (রাহ.) বলেন-

الخشوع التذلل مع خوف وسكون للجوارح۞

'খুশূ' হল, অন্তরের ভয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় প্রকাশ করা।
- রূহুল মাআনী ৯/২৭৫

প্রখ্যাত মুফাসসীর হাফেয ইবনে কাসীর (রাহ.) বলেন, সালাতে খুশূ-খুযূর দৌলত তাঁরই হাছিল হয়, যে নিজের অন্তরকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে শুধু নামাজের মধ্যেই নিবিষ্ট রাখে।
- তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/২৯৫

যখন কেউ এমন খুশূ-এর সাথে নামাজ আদায় করে তখনই নামাজ তার চক্ষু শীতল করে, অন্তরের প্রশান্তির কারণ হয়। যেমনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۞

"নামাজেই দান করা হয়েছে আমার চক্ষুর শীতলতা।" - মুসনাদে আহমাদ, হাদীসঃ ১২২৯৩; সুনানে নাসাঈ, হাদীসঃ ৯৩৪০। অন্য হাদীসে বেলাল (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

يَا بِلَالُ! أَقِمِ الصَّلَاةَ، وَأَرِحْنَا بِهَا۞

"নামাজের ব্যবস্থা করে আমাকে শান্তি দাও, হে বেলাল!" - সুনানে আবু দাউদ, হাদীসঃ ৪৯৮৫

এটাই তো নামাজ সম্পর্কে একজন মুমিনের অনুভূতি হওয়া উচিত। নামাজ তার জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল, অন্তরের প্রশান্তি, শান্তির আধার। পক্ষান্তরে মুনাফিক এবং যারা সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করে না তাদের জন্য নামাজ মহা কঠিন কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ۞

"নামাজকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়। তবে খুশূ-খুযূ (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়) অবলম্বনকারীদের জন্য নয়।" - সূরা বাকারা (২) : ৪৫। আরেক আয়াতে মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا۞

"(নিশ্চয়ই মুনাফিকরা) যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।" - সূরা নিসা (৪) : ১৪২

তো নামাজে খুশূ-খুযূ মুমিনের গুণ। পক্ষান্তরে খুশূ-খুযূ বিহীন অলসতার সাথে নামাজ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। আর খুশূ-খুযূ ওয়ালা নামাজই নামাজীকে সকল অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।

আসলে মুমিনের নামাজ খুশূ-খুযূ বিহীন হতেই পারে না; কারণ সে তো মহান প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কি দেহ-মন বিনীত না হয়ে পারে? আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কি মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে পারে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী অপূর্ব শৈলিতে এ কথায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন-

إِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي إِنّمَا يَقُومُ يُنَاجِي رَبّهُ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيه۞

"তোমাদের কেউ যখন নামাজে দণ্ডায়মান হয় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে আলাপ করে। সুতরাং তার উচিত সে কিভাবে আলাপ করছে সেদিকে যথাযথভাবে লক্ষ রাখা।" - মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীসঃ ৮৬১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীসঃ ৪৭৪

হযরত সা'দ বিন উমারাহ (রা.)- এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন-

صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّع۞

"যখন তুমি সালাত আদায় কর, তো এমনভাবে আদায় কর যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ সালাত।" - আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, বর্ণনা ৫৪৫৯; আলইছাবা, ইবনে হাজার ৩/৭০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হায়ছামী ১০/২৩৬, বর্ণনা ১৭৭৩৯

প্রসিদ্ধ হাদীস 'হাদীসে জিবরীল'-এ সকল ইবাদতের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে ফুটে উঠেছে খুশূ-খুযূর চূড়ান্ত রূপ-

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاك۞

"ইহসান হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তো (অবশ্যই) তোমাকে দেখছেন।" - সহীহ বুখারী, হাদীসঃ ৫০

এই হাদীসের মূল কথাও 'খুশূ'। সুতরাং কথা এটাই যে, সালাতের চূড়ান্ত সুফল অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই নামাজে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করতে হবে। খুশূ-খুযূ ওয়ালা নামাজই মুমিনকে সকল অন্যায়-অনাচার, অপকর্ম-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।

নামাজের হুকুম

নামাজ ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রুকন; বরং এটা কালেমায়ে শাহাদাতের পর দ্বিতীয় রুকন। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটা ইসলামের মূল খুঁটি। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ۞

"ইসলামের মূল খুঁটি হচ্ছে, নামাজ।"

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উপর সালাত ফরয করেন এমন উঁচু স্থানে যেখানে মানুষের পক্ষে পৌঁছা অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি রাত মে'রাজের রাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সপ্তাকাশের উপর আরশে নিয়ে এই সালাত ফরয করেন। প্রথমে রাত-দিনে সালাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতি দয়া করে এর সংখ্যা কমিয়ে নির্ধারণ করেন পাঁচ ওয়াক্ত। আর প্রতিদান ঘোষণা করেন পঞ্চাশ ওয়াক্তের বরাবর। এ থেকে প্রমাণিত হয় সালাত কত গুরুত্বপূর্ণ। সালাতকে আল্লাহ্ কত ভালোবাসেন। সুতরাং মানুষের জীবনের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ সময় এই ক্ষেত্রে ব্যয় করা অত্যন্ত জরুরী। সালাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে দলীল হচ্ছে: কুরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলমানদের ইজমা বা ঐকমত্য।

১. কুরআন থেকে দলীলঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۞

অর্থঃ "যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন নামায প্রতিষ্ঠা কর; নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয করা হয়েছে। (সূরা নিসা: ১০৩)

২। হাদিস থেকে দলিল: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মু'আয বিন জাবাল (রা:)-কে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন তাকে বলেনঃ

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۞

"তুমি তাদেরকে শিক্ষা দিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিদিন (দিনে-রাতে) তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেছেন।"

৩। সালাত ফরয হওয়ার উপর সমস্ত মুসলমান ঐক্যমত হয়েছে। এ জন্য উলামাগণ (রহ:) বলেন, কোন মানুষ যদি পাঁচ ওয়াক্ত বা কোন এক ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের, মুরতাদ, ইসলাম থেকে বহিস্কৃত। তার রক্ত ও সম্পদ হালাল। কিন্তু যদি সে তওবা করে

তার কথা ভিন্ন। অবশ্য উক্ত ব্যক্তি যদি নতুন মুসলমান হয়- ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং অনুরূপ কথা বলে তবে তার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে। তাকে উক্ত বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। তারপরও যদি সে সালাত ফরয হওয়ার বিষয়টিকে অমান্য করে তবে সেও কাফের বলে গণ্য হবে।

নামাজ ফরজ হওয়ার তিন শর্ত:-

যতক্ষণ পর্যন্ত তিনটি শর্ত একই সঙ্গে পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ নামাজ ফরজ হবে না।

ক। মুসলমান হওয়া। কাফিরের ওপর নামাজ ফরজ নয়। (আল ফিকহুল ইসলামী : ১/৬৩৭)

খ। বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। নাবালেগ সন্তানের ওপর নামাজ ফরজ নয়। (বুখারী : ১৬/৩১৫)

গ। আকেল তথা সুস্থ জ্ঞান থাকা। পাগল ও মাতালের ওপর নামাজ ফরজ নয়। (প্রাগুক্ত)

ক। মুসলিমের বিপরীত হচ্ছে কাফের। কাফেরের উপর নামাজ ফরয নয়। অর্থাৎ- কাফের অবস্থায় তার জন্য নামাজ আদায় করা আবশ্যক নয়। নামাজ ফরজ হয় মুসলিম হওয়ার পর।

খ। প্রাপ্ত বয়স্কঃ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়ার বয়সসীমা ও আলামত ইসলামের পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে। কোনো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে বালেগ হওয়ার নির্দিষ্ট আলামত পাওয়া গেলে বা নির্দিষ্ট বয়সসীমায় পৌঁছলেই তাকে বালেগ গণ্য করা হবে। এবয় তখন থেকে ইসলামী শরিয়তের বিধি-বিধান তার ওপর অর্পিত হবে।

১। ছেলেদের বালেগ হওয়ার আলামত হলো :

(i) স্বপ্নদোষ হওয়া। (ii) বীর্যপাত হওয়া। (iii) দাড়ি বা গোঁফ উঠা।

২। আর মেয়েদের বালেগা হওয়ার আলামত হলো :

(i) স্বপ্নদোষ হওয়া। (ii) হায়েজ (ঋতুস্রাব) আসা।

(iii) গর্ভধারণ করা। (iv) স্তন বড় হওয়া ইত্যাদি।

বালেগ হওয়ার উপরোক্ত নির্দিষ্ট আলামত যদি কোনো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে উভয়ের বয়স যখন হিজরি বর্ষ হিসাবে ১৫ বছর পূর্ণ হবে, তখন প্রত্যেককে বালেগ গণ্য করা হবে। ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর কোনো আলামত পাওয়া না গেলেও সে বালেগ বলেই বিবেচিত হবে। (আল ইনায়া শারহুল হেদায়া ৮/২০১; আদ্দুররুল মুখতার ৬/১৫৩; তাফসিরে কুরতুবি ১২/১৫১)

গ। আকেল বা বুদ্ধিমান হচ্ছে বিবেকহীন পাগলের বিপরীত শব্দ। কোন নারী বা পুরুষ যদি অতি বয়স্ক হওয়ার কারণে হিতাহীত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তবে সেও এ শ্রেণীর অন্তর্গত হবে। এ অবস্থায় বিবেকহীন হওয়ার কারণে তার উপর সালাত ফরয হবে না।

নামাজের প্রকারভেদ

নামাজের গুরুত্ব-তাৎপর্য ও ইসলামী বিধানগত স্থান-অবস্থানের বিবেচনায় ইসলামী শরীয়ত নামাজকে ৪টি ভাগে বিভক্তি করেছে।

১. ফরজ

২. ওয়াজিব

৩. সুন্নত

৪. নফল বা মুস্তাহাব

১. ফরজঃ ফরজ মানে অবশ্যই পালনীয়। ফরজ নামাজ অবশ্যই পড়তেই হবে। ফরজ নামাজ না পড়লে আল্লাহর হুকুম /আদেশ অমান্য করা হলো। আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় বড় ধরনের গুনাহ লেখা হবে। আর ফরজ নামাজ অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

ফরজ নামাজ আবার দুই প্রকার।

i. ফরজে আইন

ii.ফরজে কিফায়া

i. ফরজে আইন: যেসব নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আলাদা আলাদাভাবে ফরজ, তাকে ফরজে আইন নামাজ বলা হয়। যেমন- দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ।

ii. ফরজে কিফায়া: যে নামাজ প্রত্যেকের ওপর আলাদা আলাদাভাবে ফরজ নয়। এক এলাকা থেকে কতক মানুষ আদায় করলে সবার ওপর থেকে আদায় হয়ে যায়। যেমন- জানাজার নামাজ।

২. ওয়াজিব: ফরজ নামাজের পর পরই যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা-ই ওয়াজিব নামাজ। যেমন- দুই ঈদের ও বিতিরের নামাজ। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে না পড়লে গুনাহগার হবে।

৩. সুন্নত: ফরজ নামাজের সঙ্গে শরীয়ত যে নামাজকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে সেটা হলো সুন্নত।

সুন্নত নামাজ আবার দুই প্রকার।

i. সুন্নতে মুয়াক্কাদা

ii. সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা/সুন্নাতে জায়েদা

i. সুন্নতে মুয়াক্কাদা: ঐসকল নামাজ যা রাসূল (সা.) নিয়মিত আদায় করতেন। যেমন:ফজরের নামাজের আগের দুই রাকাত সুন্নত, জোহরের ফরজের আগের চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের ফরজের পরের দুই রাকাত, এশার ফরজের পরের দুই রাকাত এবং তারাবির নামাজ।

ii. সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা/সুন্নাতে জায়েদা: ঐসকল নামাজ যা রাসূল (সা.) নিয়মিত আদায় করতেন না। বিশেষ কারণ বা প্রয়োজনে ছেড়ে দিতেন।

[সুন্নাতে জায়েদা ঐ সুন্নাতকে বলে যা রাসূল (সা.) সর্বদা করেন নি বরং কখনও কখনও ছেড়ে দিয়েছেন।] যেমন: আসরের ফরজের আগে চার রাকাত নামাজ ও এশার ফরজের আগে চার রাকাত।

৪. নফল বা মুস্তাহাব: যে নামাজ পড়লে সওয়াব পাওয়া যায়, না পড়লে গুনাহ হয় না, তা-ই নফল বা মুস্তাহাব নামাজ। যেমন: তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশত,আওয়াবিন, তাহিয়্যাতুল অজু, দুখুলুল মাসজিদ, সালাতুল হাজত, সালাতুস শোকর, সালাতুত তাওবা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের নফল নামাজ রয়েছে।

নামাজের নির্ধারিত ওয়াক্ত

আল্লাহ তায়া'লা নামাজকে সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। প্রত্যেক নামাজের নির্ধারিত সময় রয়েছে, নামাজ নির্ধারিত সময়ে আদায় করা ফরজ। গ্রহণযোগ্য কোনো সমস্যা ছাড়া এক নামাজ অন্য নামাজের সময় আদায় করা কবিরা গোনাহ। নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে-

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا۝

'নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে (আদায় করা) ফরজ।' (সুরা নিসা, আয়াতঃ ১০৩)

জোহরের ওয়াক্ত : দ্বিপ্রহর থেকে সূর্য যখন একটু পশ্চিম দিকে হেলে যায়, তখন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। প্রতিটি জিনিসের আসল ছায়া ছাড়া তার ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। জুমা আর জোহরের নামাজের ওয়াক্ত এক ও অভিন্ন। (বাহরুর রায়েক : ১/৪২৩)

জোহর নামাজের উত্তম সময় : শীতকালে যত তাড়াতাড়ি জোহরের নামাজ পড়া যায় তত ভালো। গরমের দিন এক মিছিলের (ছায়ার একগুণ পরিমাণ) শেষ চতুর্থাংশে পড়া ভালো। তবে জুমার নামাজ সব মৌসুমে প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম। (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪২৯)

জুমার নামাজের উত্তম সময় : যখন জোহরের সময় হবে তখনই আজান হবে এবং ওই সময়ই মসজিদে রওনা করা জরুরি। তিনটি কাজ একসঙ্গে হবে ১. ওয়াক্ত হওয়া, ২. আজান হওয়া ও ৩. মসজিদে রওনা। তারপর ১৫/২০ মিনিট কিংবা সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা বয়ান হবে। বয়ান চলাকালীন যাদের অজু প্রয়োজন তারা অজু করে নেবে। বয়ান শেষে জুমার দ্বিতীয় আজান হবে। আজান শেষ হলে খুতবা, তারপর ফরজ নামাজ। সাধারণত শীতকালে দিন ছোট হওয়ার কারণে একটু আগে ওয়াক্ত শুরু হয়। সর্বোচ্চ দুপুর সোয়া একটা থেকে দেড়টার মধ্যে পুরো নামাজ শেষ হয়ে যাবে। যেহেতু জুমার আগে বয়ানের জন্য দীর্ঘসময় পাওয়া যায় না, তাই নামাজ শেষে পুনরায় দ্বীনি কোনো বিষয়ে বয়ান কিংবা মাসয়ালা-মাসায়েলের আলোচনা হতে পারে।

জুমার নামাজ : জুমার নামাজ মোট বারো রাকাত। ফরজের আগে (কাবলাল জুমা সুন্নত) চার রাকাত, ফরজ দুই রাকাত, ফরজের পর (বা'দাল জুমা) চার রাকাত, ওয়াক্তিয়া সুন্নত দুই রাকাত।

আসরের ওয়াক্ত : জোহরের নামাজের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসরের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। এর মাঝখানে কোনো বিরতি নেই। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত থাকে। তবে সূর্য ডোবার ১৫ মিনিট আগ পর্যন্ত উত্তম সময়। (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪২৫)

আসরের মাকরুহ ওয়াক্ত : সূর্য অস্ত যাওয়ার ১৫ মিনিট আগ থেকে নামাজের মাকরুহ সময় শুরু হয়। এই সময় নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হবে, কিন্তু মাকরুহ হবে। ইচ্ছা করে এই সময়ে নামাজ পড়লে গোনাহ হবে। আর যদি এমন হয় যে, কেউ ওই দিনের আসরের নামাজ আদায় করেনি। ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, তাহলে তাকে ওই সময়ই আসর পড়তে হবে। কিন্তু এটা মাকরুহ হবে। তবে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪৩৫)

আসরের উত্তম সময় : আসরের নামাজ সবসময় দেরি করে পড়া ভালো। কেননা আসরের পরে কোনো নফল পড়া যায় না। সুতরাং আসরের সময় হওয়ার প্রায় আধা ঘণ্টা কিংবা পৌনে এক ঘণ্টা পরে আসর পড়বে। যাতে আসরের আগে বেশি করে নফল পড়া যায়। (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪২৯)

মাগরিবের ওয়াক্ত : বেলা সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। এটা ইফতার শুরুরও সময়। ইফতার দেরি করে করা মাকরুহ, তাই ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে নেবে। আর মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হলেই আজান-ইকামত দিয়ে নামাজ আদায় করা উত্তম। পশ্চিম আকাশে বেশ কিছু সময় লালিমা থাকে, এই লালিমা শেষ হওয়ার পর একটু সাদাভাব

হয়। সাদাভাব শেষ হওয়ার পর আকাশ কালো হতে শুরু করে। আকাশ কালো হওয়ার আগ পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। অর্থাৎ আকাশের অবস্থা যতক্ষণ লাল ও সাদা মিশ্রিত থাকে ততক্ষণ মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪২৫- ২৬)

মাগরিবের উত্তম সময় : মাগরিব নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়া উত্তম। কিন্তু রমজান মাসে একটু দেরি করে পড়তে বলা হয়েছে। যাতে আগে ইফতার করে নেওয়া যায়। কারণ আগে ইফতার করতে পারলে নামাজ খুশু-খুজুর (একাগ্রতার সঙ্গে) সঙ্গে নামাজ পড়া সম্ভব। (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪৩১)

এশার নামাজের ওয়াক্ত : মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এশার ওয়াক্ত শুরু হয়। এশার ওয়াক্ত ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত থাকে। অর্থাৎ সাহরির ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত। (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪৩০)

এশার উত্তম সময় : রাতের এক-তৃতীয়াংশের শেষের দিকে এশার নামাজ পড়া উত্তম। অর্থাৎ এশার সময় হওয়ার সোয়া এক থেকে দেড় ঘণ্টা পরে এশার নামাজ পড়া। (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪৩০)

এশার মাকরুহ সময় : বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া মধ্যরাতের পর এশা পড়া মাকরুহ। রুগীর সেবা শরিয়ত অনুমোদিত প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য হতে পারে। কিন্তু ওয়াজ মাহফিল প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য হবে না। তাই ওয়াজ মাহফিলেও যথাসময়ে এশার নামাজ আদায় করা জরুরি। (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪৩১)

ফজরের ওয়াক্ত : সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত থাকে। পূব আকাশের উত্তর-দক্ষিণে যখন সাদা একটা আলো ছড়ায় তখন ফজরের ওয়াক্ত হয়। সূর্যের কিনারা দেখা পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত থাকে। ফজরের সময়ের মধ্যেও মাগরিবের মতো আকাশ সাদা ও লাল হয়। ফজরে প্রথমে আকাশ সাদা হয় তারপর লাল হয় আর মাগরিবে প্রথমে লাল হয় এরপর সাদা হয়। (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪২৩)

ফজরের উত্তম সময় : ফজরের সময় আলো উত্তর-দক্ষিণে ছড়িয়ে যাওয়ার পরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর পড়তে বলেছেন। এ সময় ফজর পড়া উত্তম এবং বেশি সওয়াব লাভের কারণ। কিন্তু রমজান মাসে আউয়াল ওয়াক্তে ফজর পড়ার মধ্যে বেশি সওয়াব। (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪২৮-২৯)

বিতির: এশার পর হতেই বিতিরের ওযাক্ত শুরু হয় এবং সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। কিন্তু রাত দ্বিপ্রহরের পরও বিতির নামাজের ওয়াক্ত মাকরুহ হয়না। যারা তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস আছে,

যদি শেষ রাতে উঠার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তবে তার বিতির নামাজ শেষ রাতে পড়াই উত্তম। যদি শেষ রাতে ঘুম ভাঙার সম্ভাবনা না থাকে, তবে এশার পর ঘুমাবার পূর্বে বিতির পড়ে নেয়া উচিত।

ইশরাক : সূর্য ওঠা শুরু হওয়া থেকে নিয়ে ১৫-২০ মিনিট পর এই নামাজের সময় শুরু হয় এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এর সময় থাকে। সময় হওয়ার পরপর ইশরাক পড়া ভালো, এটা নফল নামাজ। দুই দুই রাকাত করে চার-ছয় রাকাত যা সম্ভব পড়া। ইশরাকের নামাজ আদায়কারীর সারা দিনের সব প্রয়োজনের জন্য আল্লাহতায়ালা যথেষ্ট হয়ে যান বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। (আত তারগিব ওয়াত তারহিব : ১০০৯)

চাশত : ইশরাক এবং চাশতের নামাজের সময় এক। তবে বেলা এগারোটার দিকে চাশতের নামাজ পড়া ভালো। চাশতের নামাজ সর্বোচ্চ বারো রাকাত। এই নামাজও নফল। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ১/১২৪)

জাওয়াল : যখন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়, তখনই জাওয়ালের ওয়াক্ত শুরু হয়। জাওয়ালের নামাজ দুই থেকে চার রাকাত। এই নামাজকে দিনের তাহাজ্জুদ বলা হয়। এর নেকিও তাহাজ্জুদ নামাজের মতো। হাদিসে এসেছে, এই সময়ে আল্লাহ তা'য়ালা আসমানের সব দরজা খুলে দেন। (আত তারগিব ওয়াত তারহিব : ৮৫৭,৮৫৯,৮৬২)

আওয়াবিন : মাগরিবের ফরজের পর এই নামাজ। মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নত ছাড়া ছয় রাকাত পড়তে পারলে উত্তম। তবে মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নতসহ পড়লেও হবে। (গুনইয়াতুল মুতামালি : ৪৩০)

তাহাজ্জুদ : এই নামাজ রাতে ঘুম থেকে উঠে পড়তে হয়। উত্তম হলো, শেষ রাতে পড়া। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পূর্ণ সুস্থ ছিলেন তখন আট রাকাত পড়তেন। যখন একটু বয়স বাড়ল, তখন ছয় রাকাত পড়তেন। যখন আরও বয়স বাড়ল, শরীর ভারী হয়ে গেল তখন চার রাকাত পড়তেন। এই নামাজ দুই থেকে আট রাকাত পড়তে হয়। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্য এশার নামাজ শেষে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে গেলে ভালো। তবে বিশেষ কারণে কেউ যদি এই নামাজ উত্তম সময়ে পড়তে না পারে, তাহলে সে যদি এশার সুন্নতের পর বিতরের আগে দুই চার রাকাত নফল নামাজ তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ে নেয়, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তাকে তাহাজ্জুদের নেকি দান করবেন। (গুনইয়াতুল মুতামালি : ৪৩২)

নামাজের নিষিদ্ধ সময়:

১. সূর্যোদয়ের পর থেকে এশরাকের আগ পর্যন্ত:

সূর্য উঠার শুরু থেকে হলুদ আলো পুরোপুরি দূর না হওয়া পর্যন্ত সময়টুকুতে সব ধরনের নামাজ পড়া নিষেধ। ফকিহরা গবেষণা করে দেখেছেন সূর্য উঠার পর হলুদ আলো দূর হতে ২০ মিনিট সময় লাগে। অর্থাৎ আবহাওয়া অফিস যদি বলে, সকাল ছয়টায় সূর্য উঠবে, তার মানে ৬টা ২০ পর্যন্ত সব ধরনের নামাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. সূর্য যখন মাথার ওপরে: সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে থাকে তখনও সব ধরনের নামাজ এবং সিজদাহ করা নিষেধ। আরবি ভাষায় এ সময়কে 'জাওয়াল' বলে। যখন সূর্য একটু হেলে পড়বে তখন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। এ সময় সব ধরনের নামাজ এবং সিজদাহ করা জায়েজ। সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়তে বেশি সময় লাগে না। ফকিহরা সতর্কতাবশত সূর্য মাথার ওপরে উঠার পাঁচ মিনিট আগে এবং পাঁচ মিনিট পর পর্যন্ত নামাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

৩. সূর্য ডোবার সময়: সূর্য যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে ডুবতে শুরু করে তারপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের নামাজ পড়া নিষেধ। তবে কেউ ঐদিনের আছরের ফরজ নামাজ পড়ে না থাকলে তা পড়তে পারবে।

সাহাবী উকবা বিন আমের আল জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) আমাদের তিন সময়ে নামাজ এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। ১. সূর্য উঠার সময়, যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়।

২. সূর্য যখন মাথার ওপর ওঠে তখন থেকে পশ্চিমে হেলে পড়ার সময়টুকু। ৩. এবং সূর্য হলুদবর্ণ হওয়ার পর থেকে ডোবার আগ পর্যন্ত।' (বুখারী: ৫৫১ এবং মুসলিম: ১১৮৫)।

নিম্নের সময়গুলোতে নফল নামাজ আদায় করা মাকরুহঃ

১. ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর থেকে ফরজ নামাজের আগ পর্যন্ত ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। (মুসলিম, হাদিস: ১১৮৫)। হযরত হাফসা রা. বলেন, 'ফজরের ওয়াক্ত শুরু হলে রাসুল (সা.) সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত নামাজ ছাড়া আর কোনো নামাজ পড়তেন না।' তবে এ সময়ে কাযা নামাজ পড়া যাবে।

২. ফজর নামাজের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত নফল বা সুন্নত নামাজ পড়া মাকরুহ। (বুখারী, হাদিস: ৫৫১)

৩. আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। (বুখারী, হাদিস: ৫৫১)

৪. ইমাম যখন জুমার খুতবার জন্য বের হন, তখন থেকে ফরজ নামাজ থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। (কানযুল উম্মাল: ২১২১২)

৫. ইকামাতের সময় যেকোন নামাজ পড়া মাকরুহ। (মুসলিম, হাদিস: ১১৬০)

তবে ফজরের সুন্নতের অত্যধিক গুরুত্বের কারণে ইকামাতের পরও মসজিদের যেকোন কর্ণারে তা আদায় করতে বলা হয়েছে; যদি দ্বিতীয় রাকাত পাওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা থাকে। (মুসলিম, হাদিস: ১১৯৩; বুখারী, হাদিস: ১০৯৩)।
তবে সময় যদি এত কম হয় যে, সুন্নত পড়তে গেলে ফরজ নামাজ শেষ হয়ে যাবে; তাহলে সুন্নত পড়া মাকরুহ।

৬. খুব ক্ষুধা এবং খানার প্রতি তীব্র চাহিদা হলে ওই অবস্থায় নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। কেননা এর ফলে খাবারের সঙ্গেই মন লেগে থাকবে; নামাজের সঙ্গে নয়। (মুসলিম, হাদিস: ৮৬৯)

৭. মল-মূত্রের বেগ হলে। (মুসলিম, হাদিস: ৮৬৯)

৮. এমন কোনো বস্তুর উপস্থিতিতে, যে বস্তু নামাজ থেকে বিমুখকারী এবং খুশু-খুজুতে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী। (মুসলিম, হাদিস: ৮৬৯)

৯. ঈদের নামাজের আগে নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। ঈদের নামাজের পর ঘরেও কোনো নামাজ নেই, ঈদগাহেও নেই। (ইবনে মাজাহ: ১২৮৩; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা: ২/১৭৮, ১৭৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ৩১৬২)

১০. আরাফার ময়দানে, বিশেষ করে হজযাত্রীদের জন্য জোহর আর আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। মুজদালিফায় বিশেষ করে হজযাত্রীদের জন্য মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে। (মুসলিম, হাদিস: ১২৩৭; বুখারী, হাদিস: ১৫৬২; নাসায়ি, হাদিস: ৬৫৪)।

সময়ের আগে বা পরে নামাজ পড়া:

কেউ হয়ত জোহরের নামাজ পড়ে জানতে পারল, যে সময় সে নামাজ পড়েছে সে সময় জোহরের ওয়াক্ত ছিল না, আসরের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল, তবে তার আর দ্বিতীয়বার কাজা পড়তে হবে না। সে ইতিপূর্বে যে নামাজ পড়েছে সেটাই কাজার মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।কিন্তু যদি কেউ নামাজ পড়ে জানতে পারে, ওয়াক্ত হবার পূর্বেই নামাজ পড়েছে, তবে সেই নামাজ আদৌ আদায় হবে না, পুনরায় পড়তে হবে। নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওয়াক্ত বা সময় হওয়া জরুরি। ওয়াক্তের আগে কখনই নামাজ আদায় হবে না।

নামাজের বিধি-বিধান

নামাজের গুরুত্ব ও তার ফাজায়েল আমাদের কারো অজানা নয়। যার নামাজ সঠিক হবে তার বাকি আমলও ঠিক হবে। অতএব নামাজ আদায়ের সময় নামাজের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। সেই সঙ্গে থাকতে হবে সচেষ্ট, যেকোন ভুল হলে যেন তা শুধরে নিতে পারি। নিম্ন নামাজের বিভিন্ন হুকুম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ফরজ: নামাজে মোট ১৩ ফরজ (বাইরে ৭ ফরজ এবং ভেতরে ৬ ফরজ)।

নামাজের বাইরের ৭ ফরজ -

১. শরীর পাক হওয়া। (সূত্র: সূরা মায়িদা, আয়াত- ৬)।

২. কাপড় পাক হওয়া। (সূত্র: সূরা মুদ্দাছছির, আয়াত- ৪)।

৩. নামাজের জায়গা পাক হওয়া। (সূত্র: সূরা বাকারা, আয়াত – ১২৫)।

৪. ছতর ঢাকা (অর্থাৎ পুরুষগণের নাভি হতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত এবং মহিলাদের চেহারা, কব্জি পর্যন্ত দুই হাত এবং পায়ের পাতা ব্যতিরেকে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা)। (সূত্র: সূরা আরাফ, আয়াত-৩১)।

৫. কিবলামুখী হওয়া। (সূত্র: সূরা বাকারা, আয়াত -১৪৪)।

৬. ওয়াক্তমত নামায পড়া। (সূত্র: সূরা নিসা: ১০৩)।

৭. অন্তরে নির্দিষ্ট নামাযের নিয়ত করা। (সূত্র: বুখারী শরীফ, হাদীস নং-১)।

নামাজের ভেতরে ৬ ফরজ-

১. তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ শুরুতে আল্লাহু আকবার বলা। (সূত্র: সূরা মুদ্দাছছির, আয়াত –৩)।

২. ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ দাঁড়িয়ে পড়া। (সূত্র: সূরা বাকারা, আয়াত -২৩৮)।

৩. কিরআত পড়া (অর্থাৎ কুরআন শরীফ হতে ছোট এক আয়াত পরিমাণ পড়া)। (সূত্র: সূরা মুযযাম্মিল , আয়াত : ২০)।

৪. রুকু করা। (সূত্র: সূরা হজ্জ, আয়াত : ৭৭)।

৫. দুই সিজদা করা। (সূত্র: সূরা হজ্জ, আয়াত -৭৭)।

৬. শেষ বৈঠক (নামাযের শেষে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা)। (সূত্র: আবু দাউদ, হাদীস নং-৯৭০)।

বি.দ্র. নামাজী ব্যক্তির নিজস্ব কোন কাজের মাধ্যমে (যেমন- সালাম ফিরানো) নামায থেকে বের হওয়াও একটা ফরজ। (সূত্র: আল বাহরুর রায়িক, ১:৫১৩)।

নামাজের মধ্যে কোন ফরজ বাদ পড়লে নামাজ বাতিল হয়ে যায়। সাহু সিজদা করলেও নামায সহীহ হয় না। (প্রমাণসূত্র: আল বাহরুর রায়িক-১: ৫০৫, শামী, ১:৪৪৭/ হিদায়া, ১: ৯৮)।

ওয়াজিব: নামাজের ওয়াজিব ১৪টি

১. প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহা পূর্ণ পড়া। (বুখারী ১/১০৪, হাদিস : ৭৫৬)

২. প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য একটি সুরা বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ মেলানো। (বুখারী ১/১০৫, হাদিস : ৭৭৬, মুসলিম ১/১৮৫,   হাদিস : ৪৫১)

৩. ফরজের প্রথম দুই রাকাতকে কিরাতের জন্য নির্দিষ্ট করা। (বুখারী ১/১০৫, হাদিস : ৭৭৬, মুসলিম ১/১৮৫, হাদিস : ৪৫১)

৪. সুরা ফাতিহা অন্য সুরার আগে পড়া।

(বুখারী ১/১০২, ১০৩, হাদিস : ৭৪৩, মুসলিম ১/১৯৪, হাদিস : ৪৯৮, তিরমিজি, হাদিস : ১/৫৭, হাদিস : ২৪৬ সহিহ)

৫. নামাজের সব রুকন ধীরস্থিরভাবে আদায় করা (অর্থাৎ রুকু, সিজদা ও রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এবং দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ দেরি করা)। (বুখারী ১/১০৯, হাদিস : ৭৯৩, মুসলিম ১/১৭০, হাদিস : ৩৯৭, আবু দাউদ ১/১২৪, ১২৪, হাদিস : ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮)

৬. প্রথম বৈঠক করা (অর্থাৎ তিন অথবা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের দুই রাকাতের পর বসা)। (বুখারী ১/১১৪, হাদিস : ৮২৮)

৭. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পড়া। (বুখারী ১/১১৫, হাদিস : ৮৩০, ৮৩১, মুসলিম ১/১৯৪, ১৭৩, হাদিস : ৪৯৮, ৪০২, ৪০৩, তিরমিজি ১/৮৯, হাদিস : ৩৯১)

৮. প্রতি রাকাতের ফরজ ও ওয়াজিবগুলোর তারতিব বা ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।
(বুখারী ২/৯২৪, হাদিস : ৬২৫১, তিরমিজি ১/৬৬, ৬৭, হাদিস : ৩০২, ৩০৩)

৯. ফরজ ও ওয়াজিবগুলো নিজ নিজ স্থানে আদায় করা। (যেমন—দ্বিতীয় সিজদা প্রথম সিজদার সঙ্গে করা। প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়াতু শেষ করে তৎক্ষণাৎ তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি। (বুখারী ২/৯২৪, হাদিস : ৬২৫১, তিরমিজি ১/৬৬, ৬৭, হাদিস : ৩০২, ৩০৩)

১০. বিতর নামাজে তৃতীয় রাকাতে কিরাতের পর কোনো দোয়া পড়া। অবশ্য দোয়া কুনুত পড়লে ওয়াজিবের সঙ্গে সুন্নতও আদায় হয়ে যাবে। (বুখারী ১/১৩৬, হাদিস : ১০০২, তিরমিজি ১/১০৬, হাদিস : ৪৬৪১ হাসান, ইবনে মাজাহ ১/৮৩, হাদিস : ১১৮২)

১১. দুই ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা। (আবু দাউদ ১/১৬৩, হাদিস : ১১৫৩ হাসান, মুসনাদে আহমাদ ৪/৪১৬, হাদিস : ১৯৭৩৪ হাসান, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ২/১৭২, হাদিস : ৫৬৯৪ হাসান, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ৩/২৯৩, হাদিস : ৫৬৮৬)

১২. দুই ঈদের নামাজে দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত তিন তাকবির বলার পর রুকুতে যাওয়ার সময় ভিন্নভাবে তাকবির বলা। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ১/৪৯৫, হাদিস : ৫৭০৭ সহিহ, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ৩/২৯৩ হাদিস : ৫৬৮৬ সহিহ, তাহাবি ৪/৩৪৮, হাদিস : ১৬৭৪) (এই তাকবিরটি অন্যান্য নামাজে সুন্নত)

১৩. ইমামের জন্য জোহর, আসর এবং দিনের বেলায় সুন্নত ও নফল নামাজে কিরাত আস্তে পড়া। আর ফজর, মাগরিব, এশা, জুমা, দুই ঈদ, তারাবীহ্ ও রমজান মাসের বিতর নামাজে কিরাত শব্দ করে পড়া। (মুসলিম ১/২৯১, হাদিস : ২৫৯, নাসায়ি ১/১১২, হাদিস : ৯৭০ সহিহ, তিরমিজি ১/১০৬)। মনে রাখতে হবে, আস্তে পড়ার অর্থ মনে মনে পড়া নয়। কেননা এতে নামাজ শুদ্ধ হয় না; বরং আওয়াজ না করে মুখে উচ্চারণ করে পড়া জরুরি যেন নিজের কানে শোনা যায়)।

১৪. সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা। (বুখারীঃ ১/১১৫, হাদিস : ৮৩৭)

বি. দ্র: উল্লিখিত ওয়াজিবগুলো থেকে কোনো একটি ভুলে ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়া শামি, ১৪:৪৫৬, আলমগিরি, ১:৭১, আল বাহরুর রায়িক, ১:৫১০)

নামাজের সুন্নতসমূহ:

নামাজে দাঁড়ানোর সময়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুন্নত:

(১) উভয় পায়ের আঙুল কিবলামুখী করে রাখা এবং উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙুল, ঊর্ধ্বে এক বিঘত পরিমাণ ফাঁক রাখা। (২) তাকবিরে তাহরিমার সময় চেহারা কিবলার দিকে রেখে নজর সিজদার জায়গায় রাখা এবং হাত ওঠানোর সময় মাথা না ঝুঁকানো। (৩) উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের লতি পর্যন্ত ওঠানো। (৪) হাত ওঠানোর সময় আঙুলগুলো ও হাতের তালু কিবলামুখী রাখা। (৫) আঙুলগুলো স্বাভাবিক রাখা। অর্থাৎ একেবারে মিলিয়ে না রাখা, আবার বেশি ফাঁক ফাঁক করেও না রাখা। (৬) ইমামের তাকবিরে তাহরিমা বলার সঙ্গে সঙ্গে মোক্তাদির তাকবিরে তাহরিমা বলা। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন ইমামের তাকবিরে তাহরিমার আগে মোক্তাদির তাকবিরে তাহরিমা বলা শেষ না হয়। এরূপ হলে মোক্তাদির নামাজ হবে না।

(৭) হাত বাঁধার সময় ডান হাতের তালু বাঁ হাতের পিঠের (পাতার) ওপর রাখা। (৮) ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে বাঁ হাতের কবজি ধরা। (৯) অবশিষ্ট তিন আঙুল বাঁ হাতের ওপর স্বাভাবিকভাবে বিছিয়ে রাখা। (১০) নাভির নিচে হাত বাঁধা। (১১) ছানা পড়া।

(বুখারী, হাদিস : ৭৩৪, ফাতাওয়া আলমগিরি : ১/৭৩, তিরমিজি, হাদিস : ৩০৪, ২৫২ নাসায়ি, হাদিস : ৮৯২, মুস্তাদরাক : ১৭৬১, ৮৫৬, মুসলিম, হাদিস : ৩৯১, আবু দাউদ, হাদিস : ৭২৬, ৭৫৬, ৭৭৫, ফাতহুল কাদির : ১/২৫০)

নামাজের কেরাতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুন্নত:

(১) প্রথম রাকাতে ছানা পড়ার পর পূর্ণ আউজুবিল্লাহ পড়া। (২) প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহা ও সুরা মেলানোর আগে পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়া। (৩) সুরা ফাতিহার পর সবার জন্য নীরবে 'আমিন' বলা। (৪) ফরজ নামাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধু সুরা ফাতিহা পড়া। (বুখারী, হাদিস : ৭৭৬, ৭৮০, মুসলিম, হাদিস : ৭৩৩, আবু দাউদ, হাদিস : ৭৬৪)

রুকুর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুন্নত:

(১) তাকবির বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া। (২) উভয় হাত দ্বারা হাঁটু ধরা। (৩) হাতের আঙুলগুলো ফাঁক করে ছড়িয়ে রাখা। (৪) উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা। (৫) পায়ের গোছা, হাঁটু ও ঊরু সম্পূর্ণ সোজা রাখা। হাঁটু সামনের দিকে বাঁকা না করা। (৬) মাথা, পিঠ ও কোমর সমান রাখা এবং পায়ের দিকে নজর রাখা। (৭) রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবিহ পড়া।

(৮) রুকু থেকে ওঠার সময় ইমামের 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ', মোক্তাদির 'রাব্বানা লাকাল হামদ' এবং একাকী নামাজ আদায়কারীর উভয়টি বলা। (বুখারী, হাদিস : ৭৮৯, ৭৯০, ৮২৮, আবু দাউদ, হাদিস : ৭৩১, ৭৩৪, ৮৬৩, ফাতাওয়া আলমগিরি : ১/১২)

সিজদার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুন্নত:

(১) তাকবির বলা অবস্থায় সিজদায় যাওয়া। (২) হাঁটু থেকে আনুমানিক এক হাত দূরে উভয় হাত রাখা এবং হাতের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে রাখা। (৩) উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা বরাবর নাক রাখা। (৪) দুই হাতের মাঝে সিজদা করা এবং দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগের দিকে রাখা। (৫) সিজদায় পেট ঊরু থেকে এবং উভয় বাহু পাঁজর থেকে পৃথক রাখা। (৬) কনুই মাটি ও হাঁটু থেকে পৃথক রাখা। (৭) সিজদায় কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবিহ পড়া। (৮) তাকবির বলা অবস্থায় সিজদা থেকে ওঠা। (বুখারী, হাদিস : ৮০৩, ৮০৭, ৮২২, ৮২৫, মুসলিম, হাদিস : ৪০১, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩৬৬২, ১৮৮৮২, ১৮৮৮০)

নামাজে বসার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুন্নত:

(১) বাঁ পা বিছিয়ে তার ওপর বসা। ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা। উভয় পায়ের আঙুলগুলো সাধ্যমতো কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। (২) উভয় হাত রানের ওপর হাঁটু বরাবর রাখা এবং দৃষ্টি দুই হাঁটুর মাঝ বরাবর রাখা। (৩) 'আশহাদু' বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা একসঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার বৃত্ত বানানো এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় মুড়িয়ে রাখা এবং 'লা ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙুল সামান্য উঁচু করে ইশারা করা। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় আঙুলের মাথা সামান্য ঝুঁকানো। হাঁটুর সঙ্গে না লাগানো। (৪) আখেরি বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পড়ার পর দরুদ শরিফ ও দোয়া মাছুরা পড়া। (৫) উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করা এবং সালামের সময় দৃষ্টি কাঁধের দিকে রাখা। (৬) ইমামের উভয় সালামে মোক্তাদি, ফেরেশতা ও নামাজি জিনদের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (৭) মোক্তাদিদের উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লি, ফেরেশতা ও নামাজি জিনদের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (৮) একাকী নামাজি ব্যক্তি শুধু ফেরেশতাদের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (৯) মোক্তাদিদের ইমামের সালাম ফেরানোর পরপরই সালাম ফেরানো। (১০) ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফেরানো শেষ হলে মাসবুকের ছুটে যাওয়া নামাজ আদায়ের জন্য দাঁড়ানো। (বুখারী, হাদিস : ৮৩৪, ৮৩৮, মুসলিম, হাদিস : ৫৮২, ৪৩১, নাসায়ি, হাদিস : ১১৫৮, আবু দাউদ, হাদিস : ৭২৬, তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৭৭, মুসান্নাফ, হাদিস : ৩১৪৯, ৩১৪০, ৩১৫৬)

নামাজের মুস্তাহাব সমূহ:

১। দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার স্থানের দিকে, রুকু অবস্থায় উভয় পায়ের পাতার উপর, সেজদার সময় নাকের দিকে, বৈঠকের সময় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখা। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৫০৩)

২। তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় হাত চাদর থেকে বাহিরে বের করে রাখা।

৩। সালাম ফিরানোর সময় উভয় কাঁধের উপর দৃষ্টি রাখা। (মারাকিল ফালাহ-১৫১)

৪। নামাজে মুস্তাহাব পরিমান ক্বেরাত(ফজর ও যোহরে তিওয়ালে মুফাস্যাল,সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত।আছর ও ইশাতে আওসাতে মুফাস্যাল, সূরা তরেক থেকে বায়্যিনা পর্যন্ত। মাগরীবে কিসারে মুফাস্যাল সূরা যিলযাল থেকে শেষ পর্যন্ত।)পড়া। (ফাতাওয়া শামী-২/২৬১)

৫। জুমআর দিন ফজরের নামাজে প্রথম রাকাতে সূরা আলিফ-লাম-মিম সেজদা ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহর পড়া। (ফাতাওয়া শামী-২/২৬৫)

৬। যথা সম্ভব কাঁশি ও ঢেকুর চেপে রাখা। (ফাতাওয়া শামী-২/১৭৬)

৭। হাই আসলে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা। (ফাতাওয়া শামী-২/১৭৭)

নামাজের মাকরুহসমূহ:

১. সালাতরত অবস্থায় কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা মাকরূহ, যদি তা আমলে কাসীর না হয় আর আমলে কাসীর হলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

২. সিজদার স্থান থেকে কংকর বা পাথরকণা সরানো (মাকরূহ) অবশ্য সিজদা করা অসম্ভব হলে এক-দুইবার কংকর সরানোর অবকাশ আছে।

৩. আঙ্গুল সমূহকে মলা বা টেনে ফুটানো।

৪. বস্ত্র, শরীর অথবা দাঁড়ির সাথে খেলা করা।

৫. কোমরে হাত রাখা মাকরূহ।

৬. ডানে-বামে মুখ ফিরানোর দ্বারা যদি সিনা কেবলার দিক থেকে ফিরে যায় তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সিনা কেবলা দিক থেকে না ফিরে, তাহলে সালাত নষ্ট। হবে না; অবশ্য সালাত মাকরূহ হবে।

৭. ওজর ছাড়াই উভয় হাটু খাড়া করে হাত মাটিতে রেখে নিতম্ব ও পায়ের ওপর কুকুরের ন্যায় বসা।

৮. সিজদায় উভয় বাহুকে (পুরুষের জন্য) মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।

৯. হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।

১০. ফরয সালাতে বিনা ওজরে আসন করে বসা।

১১. মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড় হেফাযত করা।

১২. সদলে ছাওব করা অর্থাৎ কাপড় কাঁধে রেখে তার উভয় প্রান্ত একত্র না করে ঝুলিয়ে দেয়া।

১৩. ইচ্ছাকৃত হাই তোলা। হাই ও হাঁচি যথাসম্ভব প্রতিহত করবে। না পারলে সমস্যা নেই।

১৪. শরীরের অলসতা দূর করার জন্য মোচড়ানো।

১৫. চোখ বন্ধ রাখা। অথচ দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখা উচিৎ।

১৬. চুল মাথার ওপর ভাজ করে গিরা দিয়ে সালাত পড়া। মাথায় চুল থাকলে সালাতের মধ্যে তা ছেড়ে রাখা সুন্নাত যাতে চুলও সিজদা করতে পারে।

১৭. খোলা মাথায় সালাত পড়া মাকরূহ। তবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের নিমিত্তে এরূপ করলে মাকরূহ হবে না।

১৮. আয়াত ও তাসবীহসমূহ হাতে গণনা করা। তবে সাহেবাইন (রাহি.) এর মতে এটা মাকরূহ নয়।

১৯. শুধু ইমাম সাহেব মসজিদের মেহরাবে এবং সমস্ত লোক মেহরাবের বাইরে দাঁড়ানো।

২০. ইমাম সাহেব একা উঁচু স্থানে এবং সমস্ত লোক নিচে দাঁড়ানো।

২১. কাতারে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পিছনে একা দাঁড়ানো। তবে যদি সুযোগ না থাকে তাহলে (সামনের কাতার থেকে মাসআলা জানে এমন একজনকে টেনে এনে নিজের সাথে দাড় করাবে। তার পরও চেষ্টা করবেন একা শুধু কাতারে না দাঁড়াতে।

২২. মানুষ অথবা জন্তর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা।

২৩. সামনে, বামে অথবা ডানে ছবি থাকাবস্থায় সালাত মাকরূহ। তবে যদি ছবি পায়ের নিচে কিংবা পিছনে থাকে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

২৪. সালাতের কোন সুন্নাত পরিত্যাগ করা।

নামাজ ভঙ্গের কারণসমূহ:

১. নামাজে অশুদ্ধ কিরাত পড়া। যতটুকু অশুদ্ধ পড়লে কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই নামাজ আবার পড়তে হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামি : ১/৬৩৩-৬৩৪, হিন্দিয়া : ১/৮০, ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ৩/৩৪৪)

২. নামাজের ভেতর কথা বলা। নামাজে এমন কোনো অর্থবোধক শব্দ করা, যা সাধারণ কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামি : ১/৬১৩, আল বাহরুর রায়েক : ২/২)

৩. নামাজরত অবস্থায় কোনো লোককে সালাম দেওয়া। (ফাতাওয়ায়ে শামি : ২/৯২, আল বাহরুর রায়েক : ২/১২০)

৪. কারো সালামের উত্তর দেওয়া। (বুখারী, হাদিস : ১২১৭)

৫. ব্যথা কিংবা দুঃখে উহ-আহ শব্দ করা।

(আদ্দুররুল মুখতার : ১/৬১৯, আল বাহরুর রায়েক : ২/৪, মারাকিল ফালাহ : ১/১২১)

৬. বিনা কারণে কাশি দেওয়া। (ফাতাওয়ায়ে শামি : ৩/৬১৮, মারাকিল ফালাহ : ১/১২১, আল বাহরুর রায়েক : ২/৫)

৭. আমলে কাসির করা। ফিকাহবিদরা আমলে কাসিরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো, কোনো মুসল্লি এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যার কারণে দূর থেকে কেউ তাকে দেখলে তার মনে প্রবল ধারণা জন্মাবে যে ওই ব্যক্তি নামাজরত নয়। (ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ৩/৪৮৫, ফাতাওয়ায়ে শামি : ১/৬২৪-৬২৫, বায়েউস সানায়ে : ১/২৪১)

৮. দুনিয়াবি কোনো বিপদে কিংবা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা। (হাশিয়াতু তাহতাবি : ১/৩২৫, ফাতাওয়ায়ে শামি : ১/৬১৯, নুরুল ইজাহ, পৃ. ৬৮)

৯. তিন তাসবিহ পরিমাণ সতর খুলে থাকা। নামাজি ব্যক্তির নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের কোনো স্থান যদি তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় অনাবৃত থাকে, তাহলে তার নামাজ ভেঙে যাবে। (ফাতওয়ায়ে শামি : ১/২৭৩, কাফি : ১/২৩৮, মাওয়াহিবুল জলিল : ১/৩৯৮, মুগনিল মুহতাজ : ১/১৮৮, হাশিয়াতুত তাহতাবি : ১/৩৩৭)

উল্লেখ্য, নারীদের মাথাও সতর। কোনো কারণে মাথার ওড়না সরে গেলে নামাজ ভেঙে যাবে।(আবু দাউদ, হাদিস : ৬৪১, তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৭, ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৬৫৫)

১০. মুক্তাদি ছাড়া অন্য ব্যক্তির লোকমা (ভুল সংশোধন) নেওয়া। যেমন—ইমাম সাহেব কিরাতে ভুল করছেন, সঙ্গে সঙ্গে নামাজের বাইরের কোনো লোক লোকমা দিলে তা গ্রহণ করা। (ফাতাওয়ায়ে শামি : ১/৬২২, হিন্দিয়া : ১/৯৮)

১১. সুসংবাদ বা দুঃসংবাদের প্রতি-উত্তর করা। (ফাতাওয়ায়ে শামি : ১/৬১৩, আল বাহরুর রায়েক : ২/২)

১২. অপবিত্র জায়গায় সেজদা করা। (বাদায়েউস সানায়ে : ১/১১৫, আল বাহরুর রায়েক : ২/৩৭, তাবয়িনুল হাকায়েক : ১/৯৫)

১৩. কিবলার দিক থেকে সিনা (বুক) ঘুরে যাওয়া। তবে অপারগতাবশত যানবাহনে নামাজের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন। (মারাকিল ফালাহ : ১/১২১, নূরুল ঈজাহ : ১/৬৮)

১৪. নামাজে কোরআন শরিফ দেখে পড়া। (মারাকিল ফালাহ ১/১২৪, হাশিয়াতুত তাহতাবি ১/৩৩৬)

১৫. নামাজে শব্দ করে হাসা। (কানজুদ্দাকায়েক : ১/১৪০)

১৬. নামাজে সাংসারিক (দুনিয়াবি) কোনো বিষয় প্রার্থনা করা। (ফাতাওয়ায়ে শামি : ১/৬১৯, আল বাহরুর রায়েক : ২/৩)।

১৭. হাঁচির জবাব দেওয়া। (ফাতাওয়ায়ে শামি :২/১১৭)

১৮. নামাজরত অবস্থায় খাওয়া ও পান করা। (মারাকিল ফালাহ : ১/১২১, নুরুল ঈজাহ : ১/৬৮)

১৯. ইমামের আগে মুক্তাদি দাঁড়ানো। মুক্তাদির পায়ের গোড়ালি ইমামের আগে চলে গেলে নামাজ ভেঙে যাবে। তবে যদি (দুজনের জামাতে নামাজের ক্ষেত্রে) মুক্তাদি ইমামের পায়ের গোড়ালির পেছনেই দাঁড়ায়; কিন্তু তিনি লম্বা হওয়ার কারণে তাঁর সিজদা ইমাম সাহেবকে অতিক্রম করে যায়, তাহলে তাঁর নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে : ১/১৫৯, আল মাবসুত লিস সারাখসি : ১/৪৩)

এখানে নামাজ ভঙ্গের প্রসিদ্ধ ১৯টি কারণ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এর বাইরেও নামাজ ভঙ্গ হওয়ার আরো কারণ আছে। যেমন—কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী পাশে এসে নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ইমামের আগে কোনো রোকন আদায় করে ফেলা, ইচ্ছাকৃত অজু ভাঙার মতো কোনো কাজ করে ফেলা, পাগল, মাতাল কিংবা অচেতন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নামাজ ভঙ্গের কারণ।

সালাতের প্রাকটিক্যাল পদ্ধতিঃ

★ কোনো দিকে না তাকিয়ে এবং অন্য দিকে না ফিরে পুরো শরীরে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। ★ অন্তরে নিয়ত করবে। ★ 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরিমা বাঁধবে। ★ ডান হাতের কব্জি বাঁ হাতের কব্জির ওপর রেখে নাভির নিচে রাখবে। ★তারপর ছানা পড়বে। ★ অতঃপর 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম' বলবে। ★ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' বলে সূরা আল-ফাতিহা পড়বে। ★ তারপর কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয় তা পড়বে, ফজরের সালাতে ক্বিরাত লম্বা করবে। ★ তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে যাবে অর্থাৎ আল্লাহর সম্মানে- তার পিঠকে ঝুঁকাবে, সুন্নাত হচ্ছে তার পিঠকে মাথা বরাবর নোয়াবে এবং দুই হাত হাটুতে রেখে আঙ্গুলগুলো ফাঁকা করে রাখবে। ★ রুকুতে তিনবার বলবে, সুবহানা রব্বিয়াল আযীম। ★ সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে রুকু থেকে উঠবে। ★ রুকু থেকে উঠে বলবে 'রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ'.... ★ আল্লাহু আকবার বলে বিনয়ের সাথে প্রথম সিজদাহ'য় যাবে এবং তার সাতটি অঙ্গে সিজদাহ করবে: নাকসহ কপাল, দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পায়ের সামনের অংশ। তার বাহুদ্বয় তার পার্শ্ব থেকে ফাঁকা রাখবে, দুই হাত মাটিতে বিছাতে পারবে না এবং আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী রাখবে। ★ সিজদায় তিনবার বলবে: 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'। ★ আল্লাহু আকবার বলে সিজদাহ থেকে মাথা উঠাবে। ★ দুই সিজদাহ'র মাঝে ডান পা খাড়া রেখে বাঁ পায়ের ওপর বসবে এবং হাত উরুর ওপর হাটুর নিকটে রাখবে। ★ দুই সিজদাহ'র মাঝে বসাবস্থায় বলবে: 'রব্বিগ ফিরলী ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুকনী, ওয়াজবুরনী ওয়া'আফিনী।' ★ আল্লাহু আকবার বলে বিনয়ের সাথে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে, প্রথম সিজদাহ'র মতো যা বলার এবং করার তা করবে। ★ আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে উঠে প্রথম রাকাআতের মতো দ্বিতীয় রাকাআত সম্পন্ন করবে কিন্তু এতে ছানা বলবে না। ★ দ্বিতীয় রাকাআতের; দু-সিজদা শেষ করে আল্লাহু আকবার বলে বসবে যেভাবে

বসেছিল দুই সিজদাহ'র মাঝে। ★ এ বৈঠকে তাশাহহুদ [এবং যদি দুই রাকাআতের সালাত হয়; তাহলে দরুদে ইবরাহিম এবং দোআয়ে মাছুরা]। ★ তারপর "আস-সালামু আলাইকুম ওয়া-রহমাতুল্লাহ্" বলে প্রথমে ডানে তারপর বাঁয়ে সালাম ফিরাবে। ★ আর যদি সালাত তিন রাকাআত বা চার রাকাআত বিশিষ্ট হয় তাহলে প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে, তারপর বাকী সালাত দ্বিতীয় রাকাআতের মতো পুরা করবে, কিন্তু এতে শুধু সূরা আল-ফাতিহা পড়বে। ★ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ এবং দোআয়ে মাসুরা পুরোটা পড়বে। ★ তারপর "আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্" বলে প্রথমে ডানে; পরে বাঁয়ে সালাম ফিরাবে।

নামাজ না পড়ার শাস্তি

ঈমান আনার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো নামাজ। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে নামাজ অন্যতম ইবাদত। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ। মুসলমানমাত্রই নামাজ পড়তে হবে। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, ইশারায়—যে অবস্থায় সম্ভব নামাজ ছাড়া যাবে না। একজন মুমিন ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে, দেশে-বিদেশে, সাগরে-মহাকাশে যেখানেই অবস্থান করে, তাকে নামাজ পড়তেই হবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, '...নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।' (সূরা : নিসা, আয়াত : ১০৩)। নামাজ না পড়া জঘন্যতম অপরাধ। বেনামাজির জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা।

১। জাহান্নামে যাওয়ার কারণ : নামাজ না পড়া পরকালে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। পবিত্র কুরআনে এসেছে, '(জাহান্নামিদের জিজ্ঞাসা করা হবে) তোমাদের কোন জিনিস সাকারে (জাহান্নাম) নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। ' (সূরা : মুদ্দাসসির, আয়াত : ৪২-৪৩)

২। জাহান্নামে কঠিন শাস্তি : বেনামাজিকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের গভীর গর্তে নিক্ষেপ করা হবে। নূহ, ইবরাহিম ও ইসরাঈল (আ.)-এর ব্যাপারে বর্ণনা করার পর পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা সালাত নষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই 'গাইয়া' প্রত্যক্ষ করবে। " (সুরা : মারইয়াম, আয়াত : ৫৯)

'গাইয়া' হলো, জাহান্নামের একটি নদীর তলদেশ, যার গভীরতা অনেক, যেখানে আছে রক্ত ও পুঁজের নিকৃষ্টতম আস্বাদ। (তাফসিরে ইবনে কাসির) 'গাইয়া' জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। (তাফসিরে কাশশাফ ও নাসাফি)।

৩। দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া : শুধু পরকালীন শাস্তি নয়, নামাজ না পড়লে ইহকালীন জীবনও বরকতশূন্য হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির আসরের সালাত কাজা হয় তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল। (মুসলিম, হাদিস : ১৩০৪)

৪। সব আমল বরবাদ: নামাজ না পড়লে ইহকালেও বহু ক্ষতি সাধিত হয়। বুরাইদা (রা.) বলেন, নবী (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আসরের নামাজ পরিত্যাগ করল তার সব আমল বরবাদ হয়ে গেল।' (বুখারী, হাদিস : ৫৫৩, ৫৯৪)

৫। কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনাকর শাস্তি : কিয়ামতের দিন বেনামাজি সর্বপ্রথম যে অপদস্থতা ও লাঞ্ছনার শিকার হবে, কুরআনের একটি আয়াতে তার বিবরণ এসেছে, যার মর্ম নিম্নরূপ :'স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে। সেদিন তাদের আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করবে। অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল, তখন তো তাদের আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে।' (সুরা : কালাম, আয়াত : ৪২-৪৩)

৬। যে নামাজ পড়েনা দ্বীনে তাঁর কোনো অংশ নেই : যে নামাজ পড়ে না তার ঈমান খুবই দুর্বল। ইসলামে তার হিস্যা খুব সামান্যই। নামাজ না পড়াকে মহানবী (সা.) কুফরি কাজ ও কাফিরের স্বভাব বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এক হাদিসে এসেছে, যার ভেতর নামাজ নেই, তার ভেতর দ্বিনের কোনো হিস্যা নেই। (মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস : ৮৫৩৯)

৭। নামাজ মুমিন ও কাফিরের পার্থক্যকারী : নামাজের মাধ্যমে ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হয়। জাবির (রা.) বলেন, আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেওয়া। (মুসলিম, হাদিস : ১৪৮)

৮। নামাজ ছেড়ে দেওয়া কুফুরি: হযরত বুরাইদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে (মুক্তির) যে প্রতিশ্রুতি আছে তা হলো নামাজ। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দেয়, সে কুফরি কাজ করে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৬২১)

এই হাদিসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। একটি ব্যাখ্যা হলো, যখন কেউ নামাজ ছেড়ে দেয়, তখন সে যেন কুফরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। তার নামাজ না পড়াটা কুফরি কাজের সমতুল্য। নামাজ না পড়া কুফুরি সদৃশ্য কাজ। তবে ওই ব্যক্তিকে সরাসরি কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ না সে নামাজ অস্বীকার করে।

৯। পরকালে কঠিন আজাব : নামাজ পড়া কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়! আর নামাজ না পড়া কত বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়! হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত

নামাজ যত্নের সঙ্গে আদায় করবে, কিয়ামতের দিন এ নামাজ তার জন্য আলো হবে। তার ঈমান ও ইসলামের দলিল হবে এবং তার নাজাতের অসিলা হবে। আর যে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত নামাজ আদায় করবে না, কিয়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে নামাজ তার জন্য আলো হবে না। দলিলও হবে না এবং সে আজাব থেকে রেহাইও পাবে না। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬৫৭৬)

১০। আল্লাহর জিম্মাদারি উঠে যাওয়া: ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ছেড়ে দিলে মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর থেকে তাঁর জিম্মাদারি বা রক্ষণাবেক্ষণ তুলে নেন। মুআজ (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) আমাকে দশটি নসিহত করেন,

তার মধ্যে বিশেষ একটি এটাও যে তুমি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ করো না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ করল তার ওপর আল্লাহ তাআলার কোনো জিম্মাদারি থাকল না।' (মুসনাদে আহমাদ : ৫/২৩৮)

মহান আল্লাহ আমাদের যথাসময়ে গুরুত্বসহকারে নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

নামাজ তরককারীর বিধান

একজন ব্যক্তির ঈমান আনার পরে সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর স্মরণে নামাজ আদায় করা। আল্লাহ তা'য়ালা প্রভু এবং মানুষ তাঁর গোলাম এ স্বীকৃতির প্রকাশ ঘটে নামাজের মাধ্যমে। নামাজ ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ। ঈমানের পরই নামাজের স্থান। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সালাত কায়েমের নির্দেশ প্রদান করে বলেন, 'তোমরা সালাত কায়েম করো এবং জাকাত দাও। আর তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে।' [সূরা বাকারা:১১০]। সকল ফকীহদের ঐক্যমতে প্রত্যেক জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর উপর নামায ফরজে আইন। যদি সে হায়েজ ও নেফাসগ্রস্থ এবং পাগল ও মাতাল না হয় অর্থাৎ এসব অবস্থায় নামায ফরজ নয়। ফরজ নামাজ আদায় না করা ভয়াবহ কবীরা গোনাহের কাজ। এব্যাপারে কুরআন-হাদিসে কঠোর ধমকি ও সতর্কবানী এসেছে। এতদসত্বেও কোনো মুসলিম যদি নামায না পড়ে তাহলে কি সে কাফের হয়ে যাবে? নাকি গুনাহগার মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে?

ইসলামি শরীয়তে নামায আদায় না করার তিনটি অবস্থা হতে পারে-

১. নামাজের আবশ্যকীয়তা অস্বীকার করা অর্থাৎ ফরজ হওয়াকেই অস্বীকার করে। যে কারণে সে নামাজ পড়ে না।

২. নামাযের আবশ্যকীয়তা স্বীকার, তবে অলসতাবশত নামাজ পড়ে না। নামায পড়া দরকার এমনটা অন্তরে পোষণ করে।

৩. নামাযের কথা ভুলে যাওয়া বা ঘুমের কারণে পরিত্যাগ করে।

তিন অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হল:

• যে ব্যক্তি নামাজের আবশ্যকীয়তা অস্বীকার করবে, সকল ফুকাহায়ে কেরামের ঐক্যমতে সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইজমা নকল করে বলেন,

'অতঃপর কেউ যদি নামায ছেড়ে দেয় তার আবশ্যকীয়তা অস্বীকার করে, তাহলে শরীয়তের 'নস' ও ইজমায়ে উম্মতের ভিত্তিতে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে।' [মাজমুউল ফাতাওয়া ২২/৪০]

আল ফিকহুল ইসলামিতে এসেছে, সকল মুসলমান এব্যাপারে একমত যে, নামাযের আবশ্যকীয়তা অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির ও মুরতাদ। কেননা এর আবশ্যকীয়তা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। [আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহ ১/৫০২]
ফাতাওয়ায়ে আলমগীরিতে এসেছে,

والرابع: لا أصلي؛ إذ ليس يجب علي الصلاة، ولم أؤمر بها، يكفر۞

'কেউ যদি বলে আমি নামায পড়বো না; কেননা নামায আবশ্যক নয় এবং এব্যাপারে শরীয়তে নির্দেশও নেই তাহলে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে।' [ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ২/২৬৮]

তবে কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত অথবা নব মুসলিম হওয়ার কারণে নামাযের আবশ্যকীয়তা অস্বীকার করে তাহলে তাকে বিষয়টা ভালোভাবে বোঝানো হবে। যদি এরপরেও অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে তাহলে কাফির হয়ে যাবে।

[মাজমুউল ফাতাওয়া ১০/৪৩৪ কিতাবুল ফিকহিল মুয়াসসার ১/২১৬, আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহ ১/৫০২]

• নামাযের আবশ্যকীয়তা বিশ্বাস করে এবং তা ছেড়ে দেওয়া গোনাহের কাজ বলে স্বীকার করে, তবে অলসতাবশত নামাজ পড়ে না। এমন ব্যক্তির ব্যাপারে চার মাযহাবের মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হল—

*** হানাফি ফিকহ—** ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির নয় এবং তাকে তাকফির করা বৈধ নয়। তবে সে ফাসিক ও কবিরা গোনাহগার বলে বিবেচিত হবে।' (আল মু'তাসার মিনাল মুখতাসার মিন মুশকিলিল আসার ১/৯৩)

আহনাফের দলিল— 'আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা সঠিকভাবে আদায় করবে এবং অলসতাহেতু তার কিছুই পরিত্যাগ করবে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্য অঙ্গীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা (সঠিকভাবে) আদায় করবে না, তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট কোন অঙ্গীকার নাই।

তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং ইচ্ছা করলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (আবু দাউদ হাদিস নং ১৪২০, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)।

নামায পরিত্যাগকারীর শাস্তির ব্যাপারে আবু হানিফা রহ. বলেন, নামায ত্যাগ করার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তবে হত্য| করা যাবে না। (আন নুতাফু ফিল ফাতাওয়া ২/৬৯৪)

*** মালেকি ফিকহ—** ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'নিশ্চয় নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির নয় বরং তাকে নামায পড়ার জন্য আদেশ করা হবে, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। মালেকি মাযহাবের গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, নামায পরিত্যাগ করা একটি গুনাহ। আর গুনাহের কারণে তাকফির করা বৈধ নয়। আর তাদের মতের স্বপক্ষে দলিল হচ্ছে এমন ব্যক্তিকে তাকফির করার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়নি। (আল জামিউ লি-মাসায়িলিল মুদাওওয়ানাহ ২/৪০৪)

নামায পরিত্যাগকারীর শাস্তির ব্যাপারে মালেকীরা বলেন, 'নামায পরিত্যাগকারীকে নির্দেশ দেওয়া হবে নামায আদায়ের, যদি সে নামায পড়ে তাহলে এভাবেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যদি সে আদায় করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।' (আল জামিউ লি-মাসায়িলিল মুদাওওয়ানাহ ২/৪০৩)

আর ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ ইমামগণ নামায পরিত্যাগকারী কাফের হওয়া সম্বলিত হাদিসকে নামাযের আবশ্যকীয়তা অস্বীকার করে পরিত্যাগ কারীর উপর প্রয়োগ করেন। আর যে অলসতাবশত নামাজ পরিত্যাগ করে তার ক্ষেত্রে এই হাদিস প্রযোজ্য হবে না।

*** শাফেঈ ফিকহ—** ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহু বলেন, 'নামায পরিত্যাগকারীকে তাকফির করা যাবে না এবং কারো জন্য বৈধ হবে না তার ব্যাপারে কুফুরির ফয়সালা দেওয়া। বরং তাকে তাওবা করতে বলা হবে, যদি সে তাওবা করে এবং নামায পড়ে তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি সে বার বার নামায ত্যাগ করে এবং এর উপর অটল থাকে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। (আল উম্ম ১/২৯১)

তারা দলিল পেশ করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের মাধ্যমে, 'যে ব্যক্তি তার নামায আদায় করবে না, তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট কোন অঙ্গীকার নাই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং ইচ্ছা করলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (আবু দাউদ হাদিস নং-১৪২০)

এই হাদিসে স্পষ্ট বলা আছে, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে বেনামাযীকে নিজ ইচ্ছায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এখন দুনিয়াতে নামায না পড়ার কারণে যদি কাফির সাব্যস্ত করি তাহলে কেমনে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন? কারণ কাফিরের জন্য তো জান্নাত চিরকালের জন্য হারাম! [মুগনিল মুহতাজি ই'লা মা'রিফাতি মাআনি আলফাজিল মিনহাজ ১/৬১২]

সুতরাং নামাজ অস্বীকারকারী নয় এমন ব্যক্তি নামাজ না পড়লে কাফির হবে না।

*** হাম্বলি ফিকহ—** ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ থেকে হাম্বলি মাযহাবে নামায পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে একাদিক মতামত রয়েছে। তাঁর থেকে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, নামায পরিত্যাগকারীকে তাকফির করা যাবে না। বরং তাকে তাওবা করতে বলা হবে। (আত তা'লিকুল কাবীর ফি মাসায়িলিল খিলাফিয়্যাতি বাইনাল আ'ইম্মাতি ৪/১৩০)

ফলে এই বর্ণনা মতে ইমাম আহমদ রহ. ও জমহুর উলামায়ে কেরামের সাথে আছেন 'নামায পরিত্যাগকারীকে' তাকফির না করার ব্যাপারে। তবে তাঁর থেকে অপর একটি বর্ণনা আছে যে, নামায পরিত্যাগ করার কারণে সে কাফের হয়ে যাবে। ফলে তাকে মুরতাদ হিসাবে কতল করা হবে। (ইবনু কুদামা, আশ শারহুল কাবীর ৩/৩৫)

এ ব্যাপারে তাঁরা দলিল পেশ করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই রেওয়ায়েতের মাধ্যমে যাতে তিনি ইরশাদ করেন, 'কোনো ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে ব্যবধান শুধু নামাজ না পড়া।' (সহিহ মুসলিম হাদিস নং- ১৪৯)

এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, 'আমাদের ও তাদের (কাফেরদেরর) মধ্যে প্রতিশ্রুতি হল নামাযের। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফরি করল।' (সুনানে নাসাঈ ১/২৩১)

জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের পক্ষ থেকে মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ এ সকল হাদিসের কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন—

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

'মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ নবীজি (ﷺ) - এর বানী , 'বান্দাহ ও কুফরের মধ্যে ব্যবধান শুধু নামাজ না পড়া' এর এই ব্যাখ্যা করে থাকেন যে, অর্থাৎ নামায ছেড়ে দেওয়ার কারণে সে কাফিরের শাস্তির উপযুক্ত হবে। আর তা হল ক্বতল। অথবা যে নামায পরিত্যাগকে বৈধ মনে করে তার ক্ষেত্রে হাদিস প্রযোজ্য হবে। অথবা নামায পরিত্যাগ বান্দাহকে কুফুরির দিকে নিয়ে যায়। অথবা তার এই কাজ কাফিরের কাজের সাদৃশ্য। অর্থাৎ নামায না পড়ার দিক দিয়ে। (শরহুন নববী আ'লা মুসলিম ২/৭১)

মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতে এসেছে, অতঃপর মুহাদ্দিসিনে কেরামের ব্যাখ্যা সমূহ থেকে একটি হল, যদি নামায পরিত্যাগ করাকে বৈধ মনে করে অথবা নামায পরিত্যাগ কুফুরি পর্যন্ত নিয়ে যায়, নিশ্চয় গুনাহ হল কুফুরের প্রতিনিধি। অথবা নামায ত্যাগকারীর ব্যাপারে আশংকা হয় সে কাফির অবস্থায় মারা যাবে। অথবা তার কাজ কাফিরের কাজের সদৃশ্য। (মিরকাতুল মাফাতিহ ২/৫১০)

তাছাড়া নামায পরিত্যাগ করা গুনাহের কাজ। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে গুনাহের কারণে বান্দাহ কাফির হয় না। যতক্ষণ না গুনাহকে বৈধ মনে করবে। আহলুস সুন্নাহর ভাষ্যকার ইমাম ত্বহাবি রহ. বলেন,

‘কোনো পাপের কারণে আমরা কোনো কিবলাপন্থী মুসলমানকে কাফির বলি না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহকে হালাল মনে না করে। (আকীদাতুত ত্বহাবি: ৬৩) এমনিভাবে হাদিসে এসেছে,

আল্লাহ তাআলা তো এমন ব্যক্তির প্রতি জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ বলে।’ [সহিহ বুখারী, হাদিস: ৪২৫]

উক্ত হাদিসে বলা হয়েছে, শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই মানুষ কোনো এক সময় জান্নাতে যেতে পারবে। নামাজের কথা এই হাদিসে বলা হয়নি। সুতরাং নামাজ না পড়লে যদি ব্যক্তি কাফেরই হয়ে যায় তাহলে সে তো জান্নাতে যেতে পারত না।

• যদি নামাযের কথা ভুলে যাওয়া বা ঘুমের কারণে পরিত্যাগ করে তাহলেও তাকফির করা যাবে না অর্থাৎ কাফির বলা যাবে না। কেননা ঘুম বা ভুলে যাওয়া হচ্ছে শরয়ী ওজর। আর এ অবস্থায় তাকফির করা বৈধ নয়। ঘুম আর ভুলে যাওয়া ‘শরয়ী ওজর’ হওয়ার দলিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বানী— তিনি বলেন, ‘যদি কেউ কোনো সালাতের কথা ভুলে যায়, তাহলে যখনই স্মরণ হবে, তখন তাকে তা আদায় করতে হবে। এ ব্যতীত সে সালাতের অন্য কোনো কাফ্ফারা নেই। (কেননা, আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন) ‘‘আমাকে স্মরণের উদ্দেশে সালাত কায়েম কর’’- (সূরাহ্ ত্বা-হা ২০/১৪)।’ (বুখারী: ৫৯৭)

এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘নিশ্চয় আমার কারণে আল্লাহ আমার উম্মত থেকে অনিচ্ছাকৃত পাপ ও ভুলকে এবং যার ওপর তাদেরকে বাধ্য করা হয় সেটা ক্ষমা করে দিয়েছেন।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ ২০৪৫, তাবারনী ৮২৭৩, বায়হাকি ১১৭৮৭)। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে অযথা তাকফির করা থেকে বিরত রাখুক, আমিন।

উপসংহার

নামাজ (সালাত) আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের দৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আদম সন্তান যখন সিজদার একটি আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সে সিজদা করে, তখন শয়তান সরে যায় এবং সে কেঁদে ফেলে এবং বলে: হায় আফসোস! আদমের পুত্রকে সিজদা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং সে সিজদা করেছিল, সুতরাং সে জান্নাতে যাবে।

আমাকে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং আমি অস্বীকার করেছি, সুতরাং আমি জাহান্নামে যাব।' (সহীহ মুসলিম, ৮১)। নামাজের গুরুত্ব কতখানি তা নিচের হাদিসটি দেখলেই বুঝা যায়। রাসূল (ﷺ)- এরশাদ করেন; "তোমরা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়, এতে সক্ষম না হলে বসে পড়, এতেও সক্ষম না হলে শুয়ে পড়"। [সহীহ বুখারী: ১১১৭-১০৬৬]। নামাজ (সালাত) আত্মাকে সাফ করে, ঝামেলা দূর করে এবং কাজকে সহজ করে দেয়। আমরা যখন নামাজ পড়ি তখন আল্লাহ আমাদের দিকে অনুগ্রহ করেন এবং আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রেরণ করেন।

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক রব্বুল আ'লামিন নামাজ (সালাত) এর হিসাব নিবেন। যদি নামাজ (সালাত) যথাযথ ভাবে এবং সময় মত সম্পাদন করে তবে তার সমস্ত বিষয় ভাল হবে এবং যদি তা অবহেলা করে তবে তার সমস্ত বিষয় নষ্ট হয়ে যাবে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ۞

"কিয়ামত দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের মাধ্যমে।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৯৪৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৬৬)। ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল সালাত। হযরত উমর (রা.)- এর প্রসিদ্ধ বাণী-

إِنّ أَهَمّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصّلَاةُ. فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ. وَمَنْ ضَيّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ۞

"নিশ্চয়ই আমার কাছে তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সালাত। যে ব্যক্তি সালাতের হেফাযত করল, যত্ন সহকারে তা আদায় করল, সে তার দ্বীনকে হেফাযত করল। আর যে তাতে অবহেলা করল, (দ্বীনের) অন্যান্য বিষয়ে সে আরো বেশি অবহেলা করবে।" (মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ২০৩৮)। নামাজ বান্দাতে গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা-

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنۡهٰى عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡكَرِ ۞

"নিশ্চয়ই সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবূত : ৪৫)।

নামাজ এর দ্বারা যেমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পাথেয় অর্জন হয়, সংকল্প করার তাওফীক হয় তেমনি এ কারণে গুনাহও মাফ হয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ۞

“পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায তার মাঝের গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩১)। অন্য হাদিসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, একজন মুসলমান আর কাফেরের মধ্যে পার্থক্য কেবল নামাজ। তাহলে বুঝা যায় যে মু’মীন জীবনে নামাজের গুরুত্ব কতখানি। আল্লাহ তায়া’লা সকল মুসলমানকে সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

তথ্যসূত্র

১. আল কুরআনুল কারীম

২. তাফসীরে ইবনে কাসির

৩. তাফসীরে কুরতুবী

৪. সহীহ বুখারী

৫. সহীহ মুসলিম

৬. সহীহ তিরমিজি

৭. সুনানে আবু দাউদ

৮. ইবনে মাজাহ্

৯. সুনানে নাসাঈ

১০. মুসনাদে আহমাদ

১১. সহীহ ইবনে হিব্বান

১২. সুনানে দারিমী

১৩. তাবারানী শরীফ

১৪. মুসতাদরাকে হাকেম

১৫. শরহু মাআ'নিল আছার (ত্বহাবী শরীফ)

১৬. আত তারগীব ওয়াত তারহীব

১৭. মাজমাউয যাওয়ায়েদ

১৮. ফতোয়ায়ে আলমগিরি

১৯. বাদায়েউস সানায়ে

২০. আদ-দুররুল মুখতার

২১. রদ্দুল মুহতার

২২. আল বাহরুর রায়েক

২৩. মজমাউল ফতওয়া

২৪. আল-মুখতার

২৫. আন নুতাফু ফিল ফাতাওয়া

২৬. জামিউ লি-মাসায়িলিল মুদাওওয়ানাহ

২৭. আল উম্ম

২৮. মুগনিল মুহতাজি ই'লা মা'রিফাতি মাআনি আলফাজিল মিনহাজ

২৯. আত তা'লিকুল কাবীর ফি মাসায়িলিল খিলাফিয়্যাতি বাইনাল আ'ইম্মাতি

৩০. আশ শারহুল কাবীর

৩১. শরহুন নববী আ'লা মুসলিম

৩২. মিরকাতুল মাফাতিহ

৩৩. মাসিক আল কাউসার

৩৪. ইন্টারনেট

৩৫. প্রাগুক্ত